বাউল রাজার প্রেম

পরেশ ভট্টাচার্য

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ
কলকাতা-৭০০ ০৭৩,

BAUL RAJAR PREM

by

PARESH BHATTACHARYA

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
তরুণ চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ
২৩ জানুয়ারী
১৯৬২

স্বর্গত মধুসূদন মজুমদারের
স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য বই—

জঙ্গল পাহাড়ী

মাঝি

ওস্তাদ

মানস গঙ্গার পথে

গুলশন

নদীর নাম গৌরী।

এপারে ওপারে ছোট বড় কত গ্রাম। নানা নামের কত মানুষের বাস সেখানে।

ছোট বড় মাটির ঘর, দালান-কোঠা, বাগান-পুকুর, মাঠ-ঘাট-প্রান্তর—সব মিলিয়ে ছবির মত গ্রাম।

নদীপারের পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে ছায়া জড়ানো গ্রামের দিকে।

মাটির পথ ধরে সারাদিন কত না মানুষের যাওয়া-আসা।

এই যাওয়া-আসার পথ ধরে গ্রামের মেয়ে-বৌরা জল ভরতে যায় ঘাটে, চাষীরা চলে মাঠে, গ্রামের মানুষেরা যায় খেয়াঘাটে, না হয় গ্রামান্তরের দিকে।

নিবিড় ছায়া জড়ানো পথ। এ পথ যেন নিত্যকালের। ওই পথের ধুলোয় মিশে সেকাল-একালের অনেক কথা। জড়িয়ে আছে অনেক কাহিনী, অনেক দুঃখ-সুখ, কান্না-হাসির ইতিকথা।

শরৎ কাল।

জোয়ারে টলমল করছে গৌরী নদীর জল। পালতোলা গহনার নৌকোগুলো চলেছে জোয়ারের টানে। হয়তো এই জোয়ারেই পৌঁছে যাবে দূরের গঞ্জে কিংবা হাটে।

পারাপারের খেয়া চলেছে যাত্রীদের নিয়ে। নদীর এপারে-ওপারে যাত্রীর ওঠা-নামা।

নদীপারে ভেড়িপথ। তারপর ফসলের ক্ষেত। সেখানে সবুজ ধানের নিবিড় সমারোহ। একটু বাতাসেই ঢেউ খেলে যাচ্ছে ধানের ক্ষেতে।

ফসলের মাঠের ধারে কাশের বন। শাদা-ফুলের সমারোহ। বাতাসের ছোঁয়ায় কাশের শিষে লাগছে দোলা।

সন্ধ্যা তখনো নামেনি।

দিনান্তের সূর্য পশ্চিমের সবুজ গাছপালার আড়ালে।

একটু বাদে আলোর রঙ বদলে যাবে। আঁধার ছড়িয়ে পড়বে আকাশের টুকরো মেঘের গায়ে, তাল-নারিকেল গাছের মাথায়। রঙিন মেঘের প্রতিবিম্ব ভাসবে গৌরীর কাকচক্ষু জলে।

সন্ধ্যের আগে ঘরে পৌঁছতে হবে, তাইতো গরু-বাছুর নিয়ে রাখাল ছেলেদের তাড়াতাড়ি পথ চলা।

পাখিরা কোন্ সকালে গিয়েছিল দূরে-দূরান্তরে খাদ্যের সন্ধানে, ক্লান্ত ডানায় তারাও দল বেঁধে ফিরছে নীড়ের ঠিকানায়।

নদীর ঘাটে জল ভরতে এসেছিল গাঁয়ের বধূরা, ভরা কলসী কাঁখে নিয়ে মাটির পথে পদচিহ্ন এঁকে ফিরে চলেছে ঘরে। ঘরে এখন অনেক কাজ! শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যা বন্দনা করতে হবে, তুলসী তলায় দেখাতে হবে প্রদীপের আলো।

সবজির ঝাঁপি নিয়ে গ্রামের চাষীরা গিয়েছিল হাটে। শূন্য ঝাঁপি নিয়ে তারা ফিরছে ঘরে। যারা গ্রামান্তরে যাবে, তারা চলেছে দ্রুত পদক্ষেপে। নয়তো সন্ধ্যের মধ্যে ঘরে পৌঁছতে পারবে না।

গ্রামে ঋষিদাস পাড়ায় ঢাক বাজছে। পূজো আসছে। তাই ঢাকের বাজনায় তালিম নিচ্ছে ঢাকী।

দিগন্তের সূর্য এবারে অস্ত যাবে। সন্ধ্যা নামবে গৌরী নদীর এপারে-ওপারে।

নদীর ধারে শূন্য চর। সবুজ ঘাসে ঢাকা। একান্তে ছোট্ট ঢিবির ওপর নিঃসঙ্গ বাবলা গাছ। গাছের ছায়াটা ম্লান হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

বাবলা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে লালন। বাঁশের বাঁশীতে দিনান্তের সুর বাজাতে সে তন্ময় হয়ে গেছে।

শুধু আজই নয়, প্রতিদিন অপরাহ্ণে সে এসে বসে এই মাটির ঢিবিটার ওপর, একটার পর একটা গান বাজিয়ে চলে।

কত সময় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়, রাতের অন্ধকার নিবিড় হয়ে নামে, তবু তার বাঁশী থামে না।

সুরের যাদুতে সম্মোহিত হয়ে যায় লালন। ভুলে যায় ঘর-সংসারের কথা। ভুলে যায় সব কিছু।

আজও লালনের চোখের সামনে অস্ত গেল সূর্য। আকাশের আলোর

আবির মুছে গেল। অন্ধকার নামলো নদীর এপার ওপারে। আকাশে জ্বললো লক্ষ নক্ষত্রের দীপ। তার প্রতিবিম্ব ভাসলো গৌরী নদীর জলে।

অন্ধকারের মধ্যে বাবলা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বাঁশীতে ভাটিয়ালী গানের সুর বাজিয়ে চলেছে লালন।

সুরের মধ্যে স্পষ্ট হলো গানের ভাষা। বাঁশী বাজানো বন্ধ করলো লালন।

গান ভেসে আসছে মাঝদরিয়া থেকে। কোনো মাঝির গান। চলতি ডিঙিতে বসে কোনো মাঝি গাইছে ভাটিয়ালী সুরের গান।

গানের সুর, গানের ভাষা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হলো।

লালন নতুন করে বাঁশীতে সুর জাগালো। তার বাঁশীর সুর আর গানের সুর একসঙ্গে মিশে গেল।

কিন্তু গান শেষ হলো না। ডিঙির সঙ্গে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল গানের ভাষা। তবু সুরটা জড়িয়ে রইলো লালনের বাঁশীতে।

হঠাৎ আওয়াজ উঠলো জলে।

নদীতীরের মাটির চাপ ভেঙে পড়েছে জলে।

চমক ভাঙলো লালনের। ফিরে তাকালো চারদিকে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হয়ে নেমেছে নদীর এপারে-ওপারে। নদী-পারের সবুজ গাছপালার ছবি মিশে গেছে অন্ধকারের রঙের সঙ্গে। শুধু চোখের সামনে নদীর অবয়বটা স্পষ্ট।

গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো লালন। তারপর বাঁশের বাঁশীটা কোমরে গুঁজে অন্ধকারের মধ্যে নদীতীরের পথ ধরলো বাড়ি যাবে বলে।

কিছুদূর এসে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে পথ। এবারে আর নদী নয়, পথের দুধারে আম কাঁঠালের বাগান। গাছের ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে পথের ওপরে। তাই অন্ধকারও এদিকে নিবিড়।

সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে পথ চলছে লালন। চলতি পথে এক জায়গায় গর্তে পা পড়লো। একটু লাগলোও যেন। তবুও দাঁড়ালো না। দৃষ্টি সামনে রেখে এগিয়ে চললো বাড়ির দিকে।

এবারে পথ শেষ হয়েছে বাগানের ধারে। বাগানের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা সংকীর্ণ পথরেখা শেষ হয়েছে বাড়ির উঠোনে।

জীর্ণ কুঁড়ের ছবিটা এখন চোখের সামনে। অন্ধকারের মধ্যেও ছবিটা কত স্পষ্ট।

জীর্ণ কুঁড়ের দিকে তাকালে লালনের মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। ভাবে, জীর্ণ কুঁড়ে আছে বলেই তো আশ্রয়টা এখনো আছে। কিন্তু ওটা যেদিন ভেঙে যাবে!

বাগানের পথ পেরিয়ে উঠোনে পা দিল লালন। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাবনার ছায়াটা মন থেকে সরে গেল।

উঠোনের কোণে তুলসীর বেদীতে প্রদীপের আলো দেখাতে এসেছে দয়াবতী। বেদীমূলে প্রদীপ রেখে গলায় আঁচল দিয়ে তুলসীকে প্রণাম জানালো সে। তারপর হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালো প্রদীপ হাতে নিয়ে।

আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল লালন। এবারে কাছে এগিয়ে আসে। বলে, সন্ধ্যে দিতে এতো দেরি হলো?

দয়াবতী সচকিত হয়ে ফিরে তাকায়। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, আমি সন্ধ্যের হিসেব পাই তুমি ফিরে এলে। আজ যে দেরি করেছো তাই সময় বুঝতে পারিনি।

প্রদীপ তুলে ধরলো দয়াবতী। কাঁপা-কাঁপা আলো পড়লো দুজনের মুখের ওপর। এই মুহূর্তে দুজনেই পড়তে চাইছে দুজনের মুখের অনুচ্চারিত ভাষা।

দয়াবতী মাথা নীচু করলো। হয়তো এই মুহূর্তের লজ্জার রঙটা গোপন করার জন্যে।

—সুন্দর?

লালন আলতো হাতে স্পর্শ করে দয়াবতীর চিবুক।

—আর তুমি?

দয়াবতীর দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—জানো, বাঁশীতে আজ নতুন গানের সুর তুলেছি। শুনবে তো?

—আমি না শুনলে আর কে শুনবে।

কোমরে গোঁজা বাঁশের বাঁশীটা হাতে তুলে নেয় লালন। ফুঁ দিতে যাবে, কিন্তু বাধা দেয় দয়াবতী। বলে, ও কি! এখন কেন? মা দেখতে পাবেন যে।

বাঁশী-বাজানো হলো না লালনের। কিন্তু হঠাৎ কি খেয়াল হলো, ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল সন্ধ্যাদীপের শিখা।

দয়াবতী বিচলিত হয়। বলে, একি করলে! সন্ধ্যের বাতি নিবিয়ে দিলে? এতে যে অকল্যাণ হয়।

লালন মৃদু হাসে। বলে, ও সব কথার কথা। মনের আলো যতক্ষণ না নিবছে, ততক্ষণ কোনো অকল্যাণ স্পর্শ করবে না। চলো।

মায়ের কণ্ঠস্বর কানে এলো এই মুহূর্তে।

—কে কথা বলছে বৌমা, লালন?

দয়াবতী তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে।

লালন বলে, এই তো মা, আমি এখানে।

মা ততক্ষণে ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। জিজ্ঞাসা করেন, লালন জমিদারের কাছারি বাড়ি গিয়েছিল কিনা।

কাছারি বাড়ি যাবে বলেই দুপুরে বেরিয়েছিল লালন। কিন্তু পথে বেরিয়ে সবই ভুলে যায়। ভিন গাঁয়ের পাগলা ভোলা গান গাইছিল রাসখোলার মোড়ে। সেই গান শুনেই তার এমন ভুল। পাগলা ভোলা মানুষটাকে যে পাগল ভাবে ভাবুক, কিন্তু লালনের চোখে মানুষটা গান-পাগলা ছাড়া আর কিছু নয়। গানই মানুষটাকে পাগল করেছে। মানুষটা জন্ম-বাউণ্ডুলে। গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়ায় নিজের খেয়ালে। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

অনেক দিন পর পাগলা ভোলাকে দেখে তাকে নিয়েই লালন মেতেছিল। তারপর ভোলা চলে যেতে লালন এসে বসে নদীর ধারে। বাকি দিনটুকু নদীর ধারে ঢিবির ওপর বসেই কেটে যায়।

—কিরে। মায়ের কণ্ঠে সেই একই জিজ্ঞাসা।—জমিদারির কাছারি বাড়ি গিয়েছিলি?

—না।

—না বলতে তোর মুখে বাধলো না?

—ভুলে গিয়েছিলাম মা।

—ছিঃ ছিঃ! এতো ভুল তোর? মায়ের কণ্ঠে মৃদু উত্তাপ। একটু চুপ করে থেকে বলেন, তুই কি ছেলেরে লালন, সেই ভর দুপুরে বেরিয়েছিস, আর এই ফিরছিস। এতক্ষণ কি কাজ করছিলি?

লালন জানে, মায়ের মনের উত্তাপ একটু বাদেই হারিয়ে যাবে। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মায়ের কথা শোনে।

—এমন করলে কি দিন চলবে ? বলি, বাঁশী বাজালে কি পেট ভরবে ? না, জমিদারের নায়েব তোর বাঁশী শুনে খাজনা মকুব করে দেবে ? যা খুশী কর। এখন তো কচি ছেলেটি নস, যে বকবো।

লালন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মায়ের কথা তবুও শেষ হয় না। তবে উত্তাপ যেন কমে এসেছে। এবারে কথার মধ্যে চাপা দুঃখটাই বড় হয়ে ওঠে !—এখন কি আগের মত বাউণ্ডুলেপনা করলে ভালো দেখায়। এতদিন না হয় একা ছিলি, আর তো একা নস। একজনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সংসার পাতিয়ে বসেছিস। এবারে একটু বুঝতে শেখ।

এবারে লালন আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। দাওয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বলে, মা—কী করবো বলতে পারো ? পাগলা মনটারে কিছুতেই বশে আনতে পারি না। আর এই জন্যেই তো আমি ঘর বাঁধতে চাইনি।

মা পদ্মাবতী ফিরে তাকালেন লালনের মুখের দিকে। তিনি ভালো করেই জানেন লালনকে। একটুতেই তার অভিমান। চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলেন, কিন্তু আমার কথাটা একবার ভেবে দেখেছিস তুই।

—মা !

লালনের কণ্ঠস্বরে আকুলতা।

—তোকে নিয়ে আমার অনেক আশা লালন। বলে মা ফিরে তাকালেন ছেলের মুখের দিকে।

মায়ের চোখে চোখ রেখে লালন বলে, অমন করে কি দেখছো মা ? দেখছো এই বাউণ্ডুলে লালন তোমার আশা পূর্ণ করতে পারবে কি না ! জানি না মা তোমার আশার কথা। জানি না, আমাকে নিয়ে তুমি কি স্বপ্ন দেখছো। তবে একটা কথা বলতে পারি, আমিও স্বপ্ন দেখি।

মা এবারে নিরুত্তর।

লালনও খানিক সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ছোট্ট ছেলেটির মত মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলে, মা—আমি যে তোমার পাগলা ছেলে।

মায়ের চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে। লালন লক্ষ্য করে, মায়ের চোখের জল বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে মাটিতে।

রাত্রে— *

দয়াবতীর মুখেও পুরোনো কথা নতুন করে শুনতে পায় লালন। —জানো, আমার জীবনে যা কিছু সবই তোমাকে নিয়ে। নয়তো আর কি আছে আমার?

লালন মৃদু শব্দ করে হাসে। বলে, আমাকে নিয়ে তোমাদের অনেক আশা, আর আমার সব আশা বুঝি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে?

দয়াবতী কথা বলে না। মাথা নীচু করে তখনো সে সমানে সলতে পাকিয়ে চলেছে।

লালন বলে, মায়ের কথার একটা অর্থ খুঁজে পাই, কিন্তু তোমার মুখে ও কথা কেন দয়া?

—সে তুমি বুঝবে না।

—কেন, আমি কি এতই অবুঝ। দয়া, আমি জানি মা কি বলতে চান, জানি তুমি কি চাও আমার কাছ থেকে। কিন্তু সব জেনেও আমি অবুঝ। দয়া—

দয়াবতী ফিরে তাকায় স্বামীর মুখের দিকে।

—দয়া, বিশ্বাস করো আমি চেষ্টা করেও পারি না নিজেকে সংসারের মধ্যে মিশিয়ে দিতে। অথচ ইচ্ছে হয়, তোমাদের মতো আমিও সংসারের স্বপ্ন নিয়ে দিন কাটাই।

কথার শেষে গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে লালন।

দয়াবতীর কণ্ঠে ফুটে ওঠে অভিমানের সুর। বলে, আমার কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু মায়ের কথাগুলো মনে রাখলে ক্ষতি কি? জানো, তোমার জন্যে মায়ের মনে কত কষ্ট। কত সময় দুঃখ করেন আমার কাছে। সেদিন তো কথা বলতে কেঁদেই ফেললেন।

লালন বলে, কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি কাউকে কষ্ট দিতে চাই না। আমার মা, আমার জন্য কষ্ট পাবেন, এ কথা আমি ভাবতেও পারি না দয়া।

দয়াবতী কথা বলছে, কিন্তু হাতের কাজ বন্ধ নেই। ন্যাকড়া ছিঁড়ে একটার পর একটা সলতে পাকিয়ে চলেছে।

হাতের কাজ শেষ হলো, কিন্তু কথা শেষ হয় না দয়াবতীর। বলে, সবই তো তোমার মনে থাকে, কিন্তু কাজের কথাগুলো মনে রাখতে পারো না?

লালন চুপ করে থাকে।

—কী, চুপ করে রইলে যে?

—কাজ আর অকাজের তফাৎটুকু আমি বুঝি না।

দয়াবতীর কণ্ঠে ফুটে ওঠে অভিমানের সুর! বলে, আমি তোমাকে আর কোনদিন কোনো কথা বলবো না। তোমার মন নিয়ে তুমি থাকো।

লালন মৃদু শব্দ করে হাসে।

—হাসছো?

—অভিমানের ছোঁয়া লাগলে তোমার সুন্দর মুখখানিকে আরো সুন্দর দেখায়।

—তাই অমন করে দেখছো?

তক্তাপোষের ওপর কাত হয়ে শুয়েছিল লালন। এবারে উঠে বসে। এগিয়ে আসে দয়াবতীর কাছে। অনুচ্চকণ্ঠে বলে, সত্যি তুমি সুন্দরী দয়াবতী।

দয়াবতী মাথা নীচু করে।

লালন এবারে আরো নিবিড় হয়ে দয়াবতীর চিবুক স্পর্শ করে।

দয়াবতীর বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত ব্যথার অনুরণন। দুটি চোখ সজল হয়ে ওঠে তার। তারপর স্বামীর বুকে মুখ রেখে বোবা কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে ওঠে।

যত কথা, যত উত্তাপ নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়। দু'জনের দৃষ্টি যায় খোলা জানালা দিয়ে বাইরে। যেখানে রাত নিবিড় হয়ে নামছে।

গভীর রাত। মৌন।

ঘুমিয়ে পড়েছে গ্রাম। পল্লী।

লালনের জীর্ণ কুটিরে প্রদীপ জ্বলছে।

ঘুমিয়ে আছে লালন। দয়াবতীও গভীর ঘুমে অচেতন।

মৌন রাত মুখর হলো। দূর থেকে ভেসে আসছে গানের সুর।

ভাটিয়ালী সুরে গান গেয়ে চলেছে গৌরী নদীর মাঝি।

যাদুকরী সুর। ঘুমের মধ্যেও স্বপ্নের মতো কানে বাজে। ঘুম ভেঙে যায় লালনের। কান পেতে শোনে যাদুকরী সুর। উঠে বসে। দয়াবতীর মুখের দিকে ফিরে চায়। ঘুমের মধ্যেও কত সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

দয়াবতীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে লালন। তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ দয়াবতীর ললাটে।

সুরটা তখন আরো স্পষ্ট হয়ে বাজছে। গৌরী নদীতে কোনো মাঝি গান গেয়ে চলেছে।

নিশির ডাকের মত গানের ভাষা, সুর লালনকে ডাকছে। উঠে দাঁড়ায় লালন। পাছে দয়াবতীর ঘুম ভেঙে যায়, তাই পা টিপে টিপে দরজার কাছে আসে।

দরজা খুলতে মৃদু আওয়াজ ওঠে। ঘুম ভেঙ্গে যায় দয়াবতীর। পাশে স্বামীকে দেখতে না পেয়ে উঠে বসে।

—কোথায় যাচ্ছো ?

দয়াবতীর জিজ্ঞাসায় থমকে দাঁড়ায় লালন। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোনো কথা বলে না। শুধু এক নজরে দয়াবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিরে চায় বাইরের দিকে।

বাড়ির দরজা খুললেই চোখের সামনে গৌরী নদীর বাঁক দেখা যায়।

গানের ভাষা, গানের সুর তখন আরও স্পষ্ট হয়ে বাজছে। লালনের পাশে দাঁড়িয়ে দয়াবতীও শোনে সেই গান।

ক্রমে মিলিয়ে যায় গান। লালন তখনো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

দয়াবতীর উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শ পায় লালন। তন্ময়তা ভেঙে যায়। বলে, জানো, ওই গান, সুর আমাকে ডাকে। সুর শুনলেই আমি পাগল হয়ে যাই। মনে হয়, আমিও যদি সারা জীবন ধরে ওই পাগল করা সুরের পিছনে ছুটে বেড়াতে পারতাম।

—কেন এমন হয় তোমার ?

—জানি না। যেদিন জানবো সেদিন হয়তো সব জানা শেষ হয়ে যাবে!

দয়াবতী কথা বলে না। স্বামীর ভাব-কাতর মুখের দিকে ফিরে চায়। কথা না বললে কি হবে, তার দু'চোখের ভাষায় অব্যক্ত জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে।

লালনের মনে পড়ে যায় সন্ধ্যের কথা। দয়াকে সে বলেছিল, বাঁশীতে নতুন গানের সুর বাজানোর কথা? বলেছিল, দয়াকে শোনাবে। কিন্তু এখনো শোনায়নি।

বিছানায় বালিশের নীচে ছিল বাঁশের বাঁশীটি। লালন হাতে তুলে নেয়

বাঁশীটি। দয়াবতীকে ডেকে বলে, নতুন গানের সুর তুলেছি বাঁশীতে। শুনবে না ?

—বেশ তো, শোনাও না।

দয়াবতীর মুখের রেখা চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—এসো, পাশে এসে বোসো। লালন কাছে ডাকে দয়াবতীকে।

—না। দয়াবতী তীর্যক ভঙ্গিতে ফিরে তাকায় স্বামীর মুখের দিকে। বলে, দূর থেকেই ভালো লাগে।

—কিন্তু এ বাঁশীওলা যে তোমার কাছের মানুষ।

লালন নিজেই এগিয়ে যায় দয়াবতীর কাছে। তাকে নিজের কাছে টেনে নেয়। তারপর বাঁশীতে সুরের আওয়াজ তুলে বলে, আমার মুখের দিকে চাও দয়া।

দয়াবতীর সুন্দর মুখখানি লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

বাঁশের বাঁশীতে ভাটিয়ালী গানের সুর বাজিয়ে শোনায় লালন। সে বাঁশীর সুরে মৌন রাতও যেন মুখর হয়ে ওঠে।

সুর নয়, সুরের মধ্যে মিশে আছে ভাষা। দয়াবতীর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সে সুরের ভাষা। সে মুগ্ধ হয়ে যায় যাদুকরী সুরে।

এক সময় সুর থেমে যায়। তবু তার রেশটুকু মিশে থাকে চার দেওয়ালের ঘরে।

বিস্ময় মেশানো দৃষ্টিতে দয়াবতী ফিরে চায় স্বামীর মুখের দিকে। বলে, এত সুর তোমার বাঁশীতে ?

গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে লালন। বলে, তবু মাঝে মাঝে সুর হারিয়ে যায় দয়া।

—না, না—ও কথা বোলো না। তোমার সুর নিয়েই তুমি থাকো। আমি আর কোনদিন তোমাকে কোনো কথা বলবো না। শুধু একটা কথা দাও—

কথা শেষ করতে পারে না দয়াবতী।

লালন বলে—কি বলবে, বলো।

দয়াবতী মাথা নীচু করে।

বাঁশীতে আবার মৃদু সুরের আওয়াজ তোলে লালন। পরমুহূর্তে বাঁশীটা

রেখে দেয় শয্যার একান্তে। বলে, কি হলো? কি বলতে চেয়েছিলে বলো?

দয়াবতী এবারে মুখ তোলে। লালন লক্ষ্য করে দয়াবতীর দু' চোখে জল টলমল করছে।

—কথা দাও, তোমার বাঁশীতে তোলা গানের সুর, আমাকে প্রথম শোনাবে তো?

—তুমিই আমার প্রথমা, তোমাতেই আমার শেষ। বলে লালন দু'হাতের আলিঙ্গনে কাছে টানে দয়াবতীকে।

জাগ্রত চেতনায় দেখা একটি সুন্দর স্বপ্ন, এই মুহূর্তে দয়াবতীকে বিবশ করে তোলে। কিছু বলতে চায় সে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে। কিন্তু বলতে পারে না। শুধু তার ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে বার বার।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠলো।

পুবের জানালা দিয়ে সে চাঁদের আলো লালনের ঘরে এসে পড়েছে।

পিলসুজের ওপর প্রদীপের শিখাটা কাঁপছে। কি মনে হলো লালনের, তালপাতার পাখার বাতাসে নিবিয়ে দিল প্রদীপ। চাঁদের আলোটা আরো স্পষ্ট হলো।

—দেখেছো। লালন বলে, শরতের চাঁদ, তুলনা নেই।

—তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো? দয়াবতী হাত রাখে লালনের হাতে।

—চলো না, বাইরে যাই।

—বাইরে!

—হ্যাঁ।

—গৌরীর ধারে সবুজ ঘাসের মখমল পাতা রয়েছে, সেখানে বসে আমি বাঁশী বাজাবো আর তুমি শুনবে। যাবে?

—না! তার চেয়ে এই ভালো। দয়াবতীর কণ্ঠস্বর আবেগমথিত। বলে, এই ছোট্ট ঘর—এখানে তুমি আর আমি।

লালন নতুন করে ফিরে চায় দয়াবতীর মুখের দিকে।

চাঁদের আলো এসে পড়েছে দয়াবতীর সুন্দর মুখে। সে আলোর চন্দন

মাখা মুখের দিকে তাকিয়ে লালন অস্ফুট কণ্ঠে একটি গানের কলি উচ্চারণ করে।

সে রাতে আর বাইরে যাওয়া হলো না ওদের। ছোট্ট ঘরটিতে বসে স্বপ্নের স্বর্গ রচনা করতে চাইলো দুজনে।

ঘরের জানালা দিয়ে আছড়ে পড়েছে চাঁদের সোনালী আলো। সে আলোর স্পর্শ দয়াবতীর মুখে চোখে।

জ্যোৎস্নার চন্দন মাখা দয়াবতীর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো অপলক দৃষ্টিতে।

আর দয়াবতীর আবেগ-বিহ্বল দৃষ্টিও লালনের স্বচ্ছ চোখের আরশিতে আপন প্রতিবিম্ব খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—বাঁশী বাজাবে না?

দয়াবতীর অনুচ্চকণ্ঠের জিজ্ঞাসার উত্তরে লালন বলে, না। এ-রাত শুধ্ তোমার আমার।

দিন কয়েক পরের কথা।

পাড়া বেড়িয়ে সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরলো লালন। সাধারণতঃ এ সময়ে কোনদিনই ফেরে না সে।

মা পদ্মাবতী দাওয়ায় বসে দয়াবতীর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন। লালনকে ফিরতে দেখেই বিস্ময় প্রকাশ করেন।—কিরে, সূয্যি আজ কোন্ দিকে উঠেছিল। সন্ধ্যে না হতেই ঘরে ফিরলি?

দয়াবতী ততক্ষণে ঘোমটা টেনে দিয়েছে মাথায়। ঘোমটার আড়ালেও সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো স্বামীর দিকে। কিন্তু শাশুড়ীর সামনে কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারলো না।

কাছে এলো লালন। বললে, সূর্য পুবেই ওঠে মা।

—তোর সঙ্গে কথায় পারবো না। পদ্মাবতী বলেন, যা, সামনে থেকে সর। দেখছিস না বৌমার চুল বাঁধছি।

দয়াবতী আড়চোখে চায় স্বামীর মুখের দিকে।

লালন পাশ কাটিয়ে ঘরে যায়। তাকের ওপর বাঁশীটা নিয়ে আবার বাইরে আসে। বলে, আমি একটু বেরুচ্ছি মা।

হাতের বাঁশীটার দিকে তাকিয়ে পদ্মাবতী বলেন, ও, ওই জন্যেই আসা। বাঁশীতেই তোর সব, না ?

লালন বলে—বাঁশী আমায় পাগল করেছে মা।

পদ্মাবতী কতকটা স্বগতোক্তির সুরে বলেন, আর তুই আমাকে পাগল করবি।

আর দাঁড়ায় না লালন। হনহন করে উঠোন পেরিয়ে চলে যায়। তার চলার পথের দিকে চেয়ে থাকেন পদ্মাবতী। লালন চোখের আড়ালে চলে যেতে বলেন, ওই এক ছেলে। কোন্ লগ্নে জন্মেছিল ভগবান জানেন। যত বয়েস বাড়ছে, ও যেন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে।

দয়াবতী নীরব। কিন্তু সে-ও মনে মনে ভাবছে স্বামীর কথা। হোক ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে, কিন্তু তার মধ্যে একজন সত্যি-মানুষ লুকিয়ে আছে।

বৌ-এর মাথায় পরিপাটি করে খোঁপা বেঁধে দিলেন পদ্মাবতী।

প্রতিদিনের মতো আজও সিঁথিতে সিদূর চিহ্ন এঁকে পদ্মাবতীকে প্রণাম করে দয়াবতী।

—জন্ম এয়োস্ত্রী থাকো বৌমা। পদ্মাবতী সস্নেহে স্পর্শ করেন দয়াবতীর চিবুক। বলেন, চেষ্টা করলে তুমি পারবে আমার বাউণ্ডুলে ছেলেটাকে সংসারী করতে।

দয়াবতী আর দাঁড়ায় না। এখন অনেক কাজ রয়েছে। হাতের কাজ না সারা পর্যন্ত বসে-দাঁড়িয়ে স্বস্তি নেই।

যেটুকু বেলা ছিল, নানা কাজে ফুরিয়ে গেল। সন্ধ্যের আগেই খিড়কির পুকুর থেকে কাপড় কেচে এলো। এবারে ঘর দরজায় জল ছিটে দিয়ে তুলসী তলায় সন্ধ্যে দেওয়ার পালা। তারপর যেতে হবে রান্নাঘরে। একই নিয়মের চাকায় বাঁধা জীবন। এর মধ্যে যেটুকু আনন্দ, যেটুকু বৈচিত্র্যতা স্বামীর সান্নিধ্য।

অন্যদিনের চেয়ে আজ আরো রাত করে ফিরেছে লালন। ঘরে প্রদীপের আলোর সামনে বসে মাকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়ে শোনাচ্ছিল দয়াবতী। লালন ঘরে ঢুকতেই তার রামায়ণ পড়া বন্ধ হলো।

—কি হলো। লালন বলে, আমি এলাম আর পড়া বন্ধ হলো। বেশ তো পড়ছিলে।

দয়াবতী ততক্ষণে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে একান্তে সরে দাঁড়িয়েছে।

ছেলে-বৌ-এর সামনে মা আর কতক্ষণ বসে থাকবেন। রামায়ণটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

এরপর লালনকে বসে থেকে খাওয়ালো দয়াবতী। তারপর স্বামীর পাতেই নিজের খাবার নিলে।

লালন দাঁড়িয়েছিল পাশে। বলে, খাও। আমি বসে থেকে খাওয়াবো।

দয়াবতী অনুচ্চকণ্ঠে বলে, পাশের কামরায় মা জেগে আছেন।

—তা হোক। লালন এবারে একটা আসন পেতে নিয়ে দয়াবতীর সামনে বসলো।

—কী ছেলেমানুষী করছো। যাও না!

—কোথায় যাবো? লালন বলে, এখন তো তোমার আঁচল ধরে বসে থাকবো।

কোনো কথাই শুনলো না লালন। দয়াবতীর সামনে সমানে বসে রইলো।

এখনো ঘরের কাজ সারা হয়নি। এঁটো-কাঁটা সরিয়ে নিতে হবে। ঘর নিকানো আছে, তারপর গোয়াল ঘরে সাঁজাল দিতে হবে। দয়াবতী এঁটো উঠিয়ে নিয়ে চলে এলো রান্নাঘরে। লালন তার বিছানার ওপর বসে রইলো খোলা জানালার পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে।

জানালার বাইরে শিউলি গাছটায় ফুল ফুটেছে। তারই গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে।

কি এক চিন্তায় উন্মনা হলো লালন। দয়াবতী কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, জানে না।

—কী ভাবছো?

উন্মনা লালন সচকিত হলো। ফিরে তাকালো, তারপর মৃদু হাসি মিশিয়ে বললে, তোমার কথাই ভাবছিলাম। এতক্ষণে চুকলো তোমার খেলাঘরের কাজ?

—খেলাঘর!

দয়াবতী ফিরে তাকায় স্বামীর মুখের দিকে।

—আমার কাছে সংসারটা হলো খেলাঘর। দিনরাত আমরা এই খেলাঘর নিয়েই মেতে আছি। আমাদের যত হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ সবই এই খেলাঘর নিয়ে।

দয়াবতীকে ভাবিয়ে তুলেছে লালন। এই তো এতদিন বিয়ে হয়েছে, দেড়-বছর হলো, এর মধ্যে কতদিন কত কথা হয়েছে কিন্তু কোনদিন তো এমন করে কিছু বলেনি।

—পুতুল খেলা দেখেছো? লালন বলে, আমরা মানুষগুলো সেই পুতুল। তফাৎ এই, ভগবান আমাদের রক্ত মাংস দিয়ে গড়েছেন। নইলে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে পুতুল ছাড়া আর কিছু নই।

—এ সব কথা কেন? দয়াবতী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে লালনের মুখের দিকে।

—মনে এলো, তাই বলছি। তোমরা মনের কথা খুলে বলতে পারো না, কিন্তু আমি পারি।

কথার মধ্যে লালন আবার কেমন যেন উন্মনা হয়ে যায়। খোলা জানালার পথে দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে।

দয়াবতী এবারে স্বামীর পাশে এসে বসে। কিন্তু কোনো কথা বলে লালনের চিন্তায় যতি চিহ্ন টানতে চায় না।

লালন নিজে থেকেই বলে, মাঝে মাঝে আমার মনটা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। আর তখন সেই হারিয়ে যাওয়া মন কি ভাবে জানো?

দয়াবতী নীরব।

লালন অনুচ্চকণ্ঠে সুর টেনে বলে, মনে হয়, এই সংসার আমার জন্যে নয়। আর—

—চুপ করলে কেন, বলো?

—আর, মনে হয়, তোমাকে বিয়ে করে আমি অন্যায় করেছি।

—না, না। তুমি অন্যায় করবে কেন! হয়তো অন্যায় আমার। আমি চেষ্টা করেও তোমার মনের মত হতে পারছি না!

এবারে লালন না হেসে পারে না। দয়াবতীকে নিবিড় ভাবে কাছে টেনে তার ভ্রমর কালো চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, আমাকে তুমি খুব ভালোবাসো, না?

—আবার ওই সব আজেবাজে কথা!

—না। এমনি বলছি।

দয়াবতী মাথা গুঁজে দেয় স্বামীর বুকে। তার চাপা নিঃশ্বাসের স্পন্দন অনুভব করে লালন।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত কেটে যায়। লালন আরও নিবিড়ভাবে কাছে টানে দয়াবতীকে। বলে, দয়া, তোমার ভালবাসার দাম বোধহয় আমি দিতে পারিনি। আমার যে কিছুই নেই।

এবারে মুখ তোলে দয়াবতী। কিন্তু গোপন অশ্রু এতক্ষণে তার দুটি চোখকে সজল করে তুলেছে। এত কাছে স্বামী, তবু কেমন যেন অস্পষ্ট মনে হয়। বলে—কে বলেছে তোমার কিছু নেই! তোমার যা আছে তা ক'জনের আছে?

লালন বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দয়াবতীর মুখের দিকে। তারপর শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয় তার চোখের জল।

রাত গভীর হলো।

ঘুমিয়ে পড়েছে দয়াবতী। কিন্তু ঘুম নেই লালনের চোখে। কি যেন এক অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসেছে। দু'চোখ খোলা রেখে শুয়ে আছে দয়াবতীর পাশে।

এক সময় কি মনে হলো লালনের। ঘুমন্ত দয়াবতীকে জাগিয়ে তুললো।

—তুমি এখনো ঘুমোওনি। দয়াবতী বলে, আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো?

—কিছু হয়নি দয়া।

—তবে।

মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থাকে লালন। তারপর একটু ইতস্ততঃ কণ্ঠে বলে, আচ্ছা দয়া, আমি যদি কোথাও চলে যাই তোমার খুব কষ্ট হবে?

—চলে যাবে! কোথায়?

দয়াবতীর স্বচ্ছ দু'চোখে তখন লালনের মুখের প্রতিবিম্ব ভাসছে।

যে কথা মনের মধ্যে চেপে রেখেছিল লালন, সেই কথা এতক্ষণে প্রকাশ করে। বলে, ভাবছি পুরীধামে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে যাবো।

—পুরী! সে তো অনেক দূর?

—হ্যাঁ, অনেক দূর। লালন এবারে তার ইচ্ছের কথাটা পুরোপুরি ব্যক্ত করে। ও পাড়ার দীনু, শম্ভু, তারপর আরো সবাই যাচ্ছে। আমারও ইচ্ছে ওদের সঙ্গে দিনকতক ঘুরে আসি। তা ছাড়া ওরা বলেছে, আমাকে টাকা-কড়িও বেশী নিতে হবে না। দীনুকে তো জানো, ওই আমার পথ-খরচা দেবে।

—না, না—তুমি যেয়ো না। দয়াবতী উতলা কণ্ঠে বলে, তুমি গেলে আমি কী নিয়ে থাকবো।

—কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে দয়া!

—যেতেই হবে, কেন?

—তুমি তো জানো, আমি সব পারি, পারি না শুধু বাউণ্ডুলে মনের লাগামটাকে ধরে রাখতে। দয়া, তুমি না বোলো না।

দয়া নীরব।

তার দুচোখে ব্যথার অশ্রু টলমল করছে।

—তুমি কাঁদছো দয়া! লালনের কণ্ঠস্বরও সিক্ত হয়ে ওঠে। তোমার কথা না পেলে আমি কোথাও যাবো না।

দয়াবতী দুচোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবে। তারপর অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলে, বেশ, কথা দিচ্ছি, তোমার ইচ্ছেয় আমি বাধা হবো না।

লালনের মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাসির রেখা। দয়াবতীকে আরো নিবিড় ভাবে বুকের কাছে টেনে নেয়। বলে, যেখানেই যাই না—আবার আমি তোমার কাছেই ফিরে আসবো, দয়া।

দয়াবতীর মুখে আর কোনো কথা নেই, তার সব কথা যেন ফুরিয়ে গেছে।

ঘরের কোণে পিলসুজের ওপর প্রদীপের শিখাটা যেন কেঁপে উঠছে।

খানিক সময় চুপ করে থেকে লালন বলে, শুনেছি সমুদ্রের ধারে অনেক সুন্দর ঝিনুক কুড়িয়ে পাওয়া যায়। আমি তোমার জন্যে অনেক ঝিনুক কুড়িয়ে আনবো।

তবুও দয়াবতী নীরব। সে শুধু চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এই মুহূর্তের দুশ্চিন্তাকে দূরে সরাতে চায়।

জীবনে কখনো সমুদ্র দেখেনি দয়াবতী।

তবু সমুদ্রকে কল্পনা করে মনে মনে। সমুদ্রের ছবিটা আঁকতে চেষ্টা করে কল্পনার রঙ তুলি দিয়ে। ভাবে, না জানি, সমুদ্র কত বড়। এপার থেকে কি সমুদ্রের ওপার দেখা যায়। হয়তো যায়, কিংবা যায় না।

চোখের সামনে দেখেছে গৌরী নদী, বাপের বাড়ি যাওয়া আসার পথে দেখেছে দুরন্ত পদ্মাকে। বর্ষায় দু'কুল ছাপিয়ে যায় পদ্মার। ভয়ংকর হয়ে ওঠে পদ্মা। দামাল ঢেউ ওঠে পড়ে পদ্মার বুকে। সে ঢেউ আছড়ে পড়ে পারের মাটিতে। পারের মাটি ধ্বসে ধ্বসে পড়ে।

বর্ষার পদ্মাকেও দেখেছে দয়াবতী। পদ্মা-পারেই যে তার বাড়ি।

কিন্তু সমুদ্র !

না জানি সমুদ্র আরো কত বড় !

লোকের মুখে শুনেছে সে, সমুদ্রের সীমা নেই, কুল-কিনারা নেই। পারে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হয়, সমুদ্র যেন মিশে গেছে আকাশের সীমানায়।

মনে মনে সমুদ্রের ছবি আঁকে দয়াবতী। দু'চোখ বন্ধ করলে দেখতে পায় সমুদ্রের নীল জল আর নীল আকাশ এক হয়ে গেছে।

সেদিন রাত্রে।

ঘুম আসছিল না দয়াবতীর। জাগ্রত-চেতনায় সমুদ্রের স্বপ্ন দেখছিল। হঠাৎ একটা রাত জাগা পাখি ডেকে উঠতে স্বপ্নটা হারিয়ে গেল। ফিরে এলো বাস্তব চেতনার রাজ্যে।

মনে এলো স্বামীর কথা।

ক'দিন হলো সে চলে গেছে।

মনে মনে দিন তারিখ হিসেব করলে দয়াবতী। প্রায় এক পক্ষ হলো।

দিনে-রাতে কতবার মনে হয় স্বামীর কথা। স্বামীর জন্যে চিন্তাও তার কম নয়। কত কথা ভাবে।

ভাবে, কতদিন লাগবে পুরীধামে পৌঁছোতে? হয়তো এক মাস, কিংবা তারও বেশী।

না জানি পথে কত কষ্ট হবে। হয়তো সময় মত খাবার জুটবে না। হয়তো আশ্রয় না পেয়ে গাছতলায় রাত কাটাতে হবে।

চিন্তার সঙ্গে কত দুশ্চিন্তা জড়িয়ে থাকে। পথ চলার কষ্টে স্বামীর যদি শরীর ভেঙে যায়। যদি অসুখ-বিসুখ করে। তা ছাড়া, তার হাতেও তো তেমন পয়সা কড়ি নেই, সে জন্যেও তো নানা অসুবিধে হতে পারে।

এরপর আরো কত চিন্তা। সমুদ্রের মত—যার শেষ নেই, সীমা নেই।

রাত হয়েছে। গভীর রাত। কিন্তু ঘুম নেই দয়াবতীর চোখে। বার বার তন্দ্রা আসছে। কিন্তু বার বার সে তন্দ্রা টুটে যাচ্ছে। কিছুতেই দুচোখের পাতা বন্ধ হবার নয়।

তবু একসময় অবসন্ন চিন্তার ডানা বন্ধ হলো। ঘুমিয়ে পড়লো দয়াবতী। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও একটা স্বপ্ন তার অবচেতন মনের রাজ্যে। যে মন ঘুমের মধ্যেও জেগে থাকে।

স্বপ্ন দেখছে দয়াবতী। সমুদ্রের স্বপ্ন।

বিশাল সমুদ্র। যার সীমা নেই, শেষ নেই। যে সমুদ্র শেষ হয়েছে আকাশের সীমানায়।

স্বপ্ন দেখছে—একটা বিরাট ঢেউ ছুটে আসছে। কী দারুণ তার শব্দ। ঢেউটা তীরের মাটিতে সশব্দে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেল দয়াবতীর।

—মা, মা, মাগো।

চাপা আর্তনাদ করে উঠে বসে দয়াবতী। দুঃস্বপ্নের রেশ তখনো তার মনের মধ্যে।

—কী হলো বৌমা?

পদ্মাবতীরও ঘুম ভেঙে গেছে দয়াবতীর আর্তকণ্ঠের 'মা' ডাক শুনে।

—না মা, কিছু না। দয়াবতী চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, স্বপ্ন দেখেছিলাম।

পদ্মাবতী চুপ করে থাকেন।

—স্বপ্ন সত্যি হয় মা? দয়াবতী অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

—রাতের স্বপ্ন রাতেই বলে না বৌমা। ঘুমোও।

তবু কি ঘুম আসে। চুপচাপ শুয়ে থাকে বিছানায়।

এবারে আর সমুদ্রের স্বপ্ন নয়, স্বামীর মুখখানিকে মনের মধ্যে আঁকতে চেষ্টা করে দয়াবতী। কিন্তু সে মুখ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠার আগেই মিলিয়ে যায়।

রাত জাগা পাখিটা আবার ডেকে উঠলো কর্কশ স্বরে। কী বিশ্রী স্বর। শুনলেই বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে।

এদিকে ঘরের কোণে পিলসুজে প্রদীপটা জ্বলছিল। নিবে গেল আচমকা হয়তো তেল নেই।

যেটুকু আলো ছিল, হারিয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে খোলা জানলাটা স্পষ্ট হলো।

খোলা জানালার দিকে তাকালো দয়াবতী। মনে পড়লো স্বামীর কথা।

মন এক চিন্তায় স্থির নয়। এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তা। এক স্মৃতি থেকে আর এক স্মৃতি।

মনে পড়ে, এ-বাড়িতে বৌ হয়ে যেদিন প্রথম এলো, সেদিনের কথা। পদ্মা পারের গাঁয়ের মেয়ে এলো গৌরী নদীর তীরে সেউড়িয়া গ্রামে। খেয়াঘাটে এসে নামলো নতুন বৌ দয়াবতী। ঘাট থেকে স্বামীর ঘর। সামান্য পথ। তবুও চার বেয়ারার পালকি করে এসেছিল। নেমেছিল বাগানের পথ পেরিয়ে বাড়ির উঠোনে।

সেদিনের ছবিটা মনের মধ্যে কত স্পষ্ট। নতুন মাথায় ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে। তারপর দুধে আলতায় পা দিলে নতুন বৌ। একটা জীয়ল মাছ হাতে ধরলে। পাড়ার বৌরা এসে বরণ করলে বৌকে। তারপরে এলো ঘরে। পিছনে তাকে অনুসরণ করে এলো স্বামী।

ঘরে ভিড় করেছে পাড়ার মেয়ে-বৌরা। নানা মুখে নানা কথা। সব কথাই নতুন বৌ-কে নিয়ে। সুন্দর বৌ হয়েছে, পটে আঁকা ছবির মত। ঘর আলো করা বৌ। যেমন মুখ, তেমন চোখ। আরো কত কথা। দয়াবতী সবই কানে শুনলো। মনটা ভরে গেল তার।

তারপর আরো মনে পড়ে, সেদিন ছিল কালরাত্রি। সন্ধ্যে না হতেই গাঁটছড়া খুলে স্বামী চলে গেল অন্য ঘরে। আজ রাতে আর দেখা হবে না। এ রাত যাবে, তারপর আগামীকাল রাতে হবে ফুলশয্যা।

ফুলশয্যার রাতের স্মৃতিটাও মনের মধ্যে এখনো অম্লান।

এই ঘরেই হয়েছিল ফুলশয্যা। পরিপাটি বিছানা পাতা, তার ওপর
না রঙের নানা ফুল ছড়ানো।

দয়াবতীর কাছে সে রাত ছিল লজ্জার আবিরে রাঙানো।

মনে আছে সে রাতে স্বামী তার ঘোমটা খুলে দিয়ে বলেছিল, লজ্জা কি ?
ামি তো তোমার কাছের মানুষ।

দয়াবতী আবার ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকেছিল। কিন্তু ঘোমটার
াড়ালেও সে দৃষ্টির পথ খুলে রেখেছিল। চোরা চাউনিতে দেখছিল নতুন
ানুষটিকে। যে মানুষটির পরিচয়—স্বামী।

কচি-কচি সুন্দর মুখ তার স্বামীর। ললাটদেশে চন্দনের বিন্দু। মাথায়
াকড়া চুলগুলো কেমন এলোমেলো। সবচেয়ে সুন্দর তার আয়ত দৃষ্টি
ার দীর্ঘ নাসিকা।

অনেক দিন আগে নয়, বিয়ের ক'মাস আগে নদের নিমাই যাত্রায় নিমাইকে
েখেছিল দয়াবতী। সেই যাত্রার আসরে দেখা নিমাই-এর সঙ্গে কোথায়
ন মিল আছে তার স্বামীর। শুভদৃষ্টির সময়েই তার মনে হয়েছিল, এই
র-দেবতাটা নিমাই নয়তো ?

—কী দেখছো অমন করে ? পিছন থেকে স্বামী তার দুটি
ত দয়াবতীর কাঁধের ওপর রেখে বলেছিল, এখনো দেখার শেষ
য়নি !

দয়াবতী ঘোমটা আরো একটু টেনে দেবে ভেবেছিল। কিন্তু তার
াগেই স্বামী তার ঘোমটা খুলে দিয়েছিল।

—লজ্জাবতী লতা। স্বামী বলেছিল, এত লজ্জা কিসের ?

দয়াবতীর দেহ-মন এরপর কেমন যেন শিথিল হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর
াখে চোখ রেখে কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারেনি। তার ভাষাও যেন
রিয়ে গিয়েছিল সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তে।

সেদিনের স্মৃতি আজও দয়াবতীকে বিবশ করে তোলে। আজও
দিনের স্মৃতি-ছবিটা মনের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পায়। সে ছবি এতটুকু
ন হয়নি। হবার নয়।

কিন্তু সেদিনের সে-রাত ছিল স্বপ্নের।

আর আজকের রাত দুঃস্বপ্নের।

সে রাতে সে চেয়েছিল, এ রাত আরো বিলম্বিত হোক।

আর আজ রাতে ওর এই মুহূর্তের প্রার্থনা, কখন রাত শেষ হবে। কখন অবসান হবে দুশ্চিন্তার।

রাত শেষ হয়ে আসছে। পাখিরা ডাকছে।

শয্যা ত্যাগ করলো দয়াবতী। উঠে এলো খোলা জানলাটার ধারে।

জানলায় দাঁড়ালে গৌরী নদী স্পষ্ট দেখা যায়।

দয়াবতী জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইলো। চোখের সামনে রাতের অবশিষ্ট অন্ধকার মুছে গেল। স্পষ্ট হলো গৌরী নদীর কায়া।

দয়াবতীর মনের মধ্যে অব্যক্ত জিজ্ঞাসা, কবে ওই গৌরীর খেয়াঘাটে ডিঙি থেকে নামবে তার স্বামী?

রাত ভোর হলো।

সূর্যের রূপালী আলোয় ভরে গেল পৃথিবী।

দিনের কাজ শুরু করলো দয়াবতী। কিন্তু কাজের মধ্যেও সে বারবার উন্মনা হয় স্বামীর চিন্তায়। বারবার ভুল হয়ে যায় তার কাজে। কিন্তু ভুল ধরার কেউ নেই। নিজের ভুল নিজেই শুধরে নেয়।

একটা দিন একটা রাত নয়। কত দিন কত রাত এলো, গেল, কিন্তু যার আশায় পথ চেয়ে থাকে, সে তবুও এলো না।

পদ্মাবতী কত রকমে বোঝায়, মিছে ভাবছো কেন বৌমা, একা তো লালন নয়, আরো যারা গেছে, তারাও তো ফেরেনি।

দয়াবতী মুখে বলে, আমি ভাবি না মা। ভাববো কেন। পুরুষ মানুষ দেশ-বিদেশ বেড়াবে তাতে ভয় কিসের। কিন্তু মনের মধ্যে সব সময়েই দুশ্চিন্তা জড়িয়ে। একটা অজানা শংকাও।

তবুও দয়াবতী সহজ হতে চেষ্টা করে। নিজেকে কত রকমে বোঝায়। কিন্তু অবুঝ মন কিছুতেই বোঝে না।

মুহূর্তের সহজ মন, আবার পরমুহূর্তের দুশ্চিন্তায় আড়ষ্ট হয়ে যায়।

তবুও দয়াবতীর দুঃখের দিনগুলো এক-এক করে ফুরিয়ে যায়।

কিন্তু দুঃখের রেশ ঠিক তেমনি করে প্রতিটি দিনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।

প্রত্যহের নিয়মে সূর্য ওঠে আবার অস্ত যায়। সংসারের ছোট্ট চাকায় জড়ানো দয়াবতীর জীবন। এত-র মধ্যে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা ঠিকই আছে। আবার

সংসারের কাজও রয়েছে। তা ছাড়া কাজ যত আছে, তার চেয়ে বেশী কাজ যেন হাতের কাছে পেতে চায় সে। কাজের মধ্যে থাকলে মন থেকে যেন চিন্তার কিছুটা দূরে সরে যায়।

দিনের পর দিন, পায়ে হেঁটে নীলাচলে পৌঁছেছে লালন। দর্শন করেছে দারুব্রহ্মকে। মন ভরে গেছে প্রভু জগন্নাথ দেবের পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে। মুগ্ধ হয়েছে সমুদ্রের বিশালত্ব দেখে।

নীলাচলে যা কিছু দর্শনীয়, সবই দেখেছে লালন। চক্রতীর্থ, গুণ্ডিচাবাড়ি, শংকরাচার্যের মঠ, টোটা গোপীনাথ থেকে আরম্ভ করে আরো কত পবিত্র স্থান। দেখেছে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি বিজড়িত স্থান, দেখেছে ঠাকুর হরিদাসের সমাধি ক্ষেত্র।

সাতদিন, সাত রাত নীলাচলে রইলো লালন। তারপর আবার ফিরে চলার পালা।

ফিরে যেতে মন চায় না। লালন অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থাকে সমুদ্রের বালুকা-বেলায়। অবাক-বিস্ময়ে সে চেয়ে থাকে বিশাল সমুদ্রের দিকে।

এ ক'দিন সকাল-সন্ধ্যায় নির্জন সমুদ্রবেলায় দাঁড়িয়ে সে দেখছে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত। দেখে অবাক হয়েছে। মনে মনে কত কি ভেবেছে। সমুদ্রের মত সে-সব ভাবনারও কুলকিনারা নেই।

কিন্তু ফিরে যাবার দিনে লালনের মনে হয়, এ-দেশ ছেড়ে আর কোথাও সে যাবে না! এখানে সমুদ্রের ঝিনুক কুড়িয়েই সে জীবন শেষ করে দেবে।

তবু শেষ পর্যন্ত তাকে ফিরে যেতে হবে তার পুরোনো ঠিকানায়। যেখানে গৌরী নদীর তীরে পল্লীর শান্ত পরিবেশে ছোট্ট কুটিরে অপেক্ষা করে আছে দয়াবতী, যেখানে এখনো মা তার জন্যে আঁচল বিছিয়ে রেখেছেন।

যে পথ ধরে এসেছিল আবার সেই পথে সঙ্গী দলের সঙ্গে ফিরে চললো লালন।

পথে সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর দর্শন করলো লালন। দর্শন করলো আরো কত জনপদ, কত অপরিচিত দেবালয়।

পথশ্রমে ক্লান্ত লালন। কিন্তু ক্লান্তি নেই তার মনে। অফুরন্ত আনন্দের উৎস মুখ যেন খুলে গেছে।

উড়িষ্যার সীমানা পেরিয়ে বাংলার মাটিতে এলো লালন। সঙ্গে সহযাত্রীরাও আছে।

এতদিনে মন যেন তার গৃহমুখী হল। মনে পড়লো মায়ের কথা, দয়াবতীর মুখের ছবি বারবার ভেসে উঠলো মনের পর্দায়। ঘরের বাইরে যেতে আনন্দ, ঘরের ঠিকানায় ফিরে যেতে তত ব্যাকুলতা।

প্রত্যাবর্তনের পথে কলিতীর্থ কালীঘাট দর্শন করলো লালন। গঙ্গাস্নানও করলো, তারপর আবার দলের সঙ্গে ফিরে চললো দেশের পথে।

বাংলার পূর্ব অঞ্চলে এসে পৌছালো লালন। আর কয়েক দিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবে বাড়ি। যেখানে তার অপেক্ষায় রয়েছেন মা, যেখানে পথের দিকে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে দয়াবতী।

নিয়তির নির্মম পরিহাস।

পথে অসুস্থ হল লালন। প্রথমে বুঝতে পারেনি যে, কাল বসন্ত রোগ তাকে আক্রমণ করেছে। দু দিন না যেতেই দারুণ ভাবে প্রকাশ পেল দুরন্ত ব্যাধি।

সহযাত্রীরা কাছে থেকে দূরে দূরে রইলো। সবাই এড়িয়ে চলতে চায় লালনকে।

লালন জানে, দারুণ সংক্রামক এই বসন্ত। তাই তো কারো বিরুদ্ধে তার অনুযোগ নেই। দুঃখও নেই সে জন্যে। এখন তার একটাই চিন্তা, শেষ পর্যন্ত বাড়ি পৌছতে পারবে তো ?

চলতে অসমর্থ দেহ, তবুও পথ চলে লালন। সর্বাঙ্গে বসন্তের দুষ্টক্ষত, তারপর দারুণ জ্বর আর যন্ত্রণা। দু'পা চলে আবার থমকে দাঁড়ায় সে। অথচ বিশ্রামের অবসর নেই। পথ তো তার জন্যে অপেক্ষা করবে না।

তবুও সারাদিন পথ চলে লালন!

ক্লান্ত অপরাহ্নের মুহূর্তে নদীর ধারে এসে পৌছলো লালন। সঙ্গীদল যেখানে আগে এসে পৌছে অপেক্ষা করছে।

সামনেই নদীর ঘাটে খেয়াপারের মাঝি ডিঙি নিয়ে অপেক্ষা করছে।

সঙ্গীরা ডিঙিতে উঠলো! কিন্তু লালন পলিমাটির ওপর দিয়ে হেঁটে ডিঙিতে উঠবে কেমন করে ?

তবুও উঠলো। কিন্তু ডিঙিতে উঠেই চেতনা হারালো সে।

'পারে এলো ডিঙি।

সহযাত্রীরা বারবার লালনের নাম ধরে ডাকলো।

কিন্তু সাড়া পেলো না।

এবারে উপয়ান্তর না দেখে সঙ্গীরা অচেতন লালনকে ধরাধরি করে পারের মাটিতে এনে শুইয়ে দিলো। তবুত জ্ঞান ফিরে এলো না।

সহযাত্রীরা ধরেই নিলে, যদিও এখনো নিঃশ্বাস পড়ছে লালনের, কিন্তু ওর নিঃশ্বাস কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে।

সুতরাং আর অপেক্ষা নয়। পলিমাটির কোমল শয্যায় লালনকে শায়িত রেখে সহযাত্রীরা ফিরে চললো।

সন্ধ্যা তখনো নামেনি। গোধূলির রঙিন আলো তখন এপার ওপারের সবুজ গাছের পাতায় পাতায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ওই আলোর স্পর্শ টুকু হারিয়ে যাবে।

জোয়ারে কানায় কানায় ভরে গেছে নদী। জল স্পর্শ করেছে পারের মাটি। লালনের গায়ে লাগছে ছোট ছোট ভাঙা ঢেউ-এর ছোঁয়া।

—মা, মাগো!

লালনের আচ্ছন্ন চেতনা ফিরে আসে।

কিন্তু কোথায় মা! চারদিকে বিষণ্ণ সন্ধ্যার শূন্যতা। অস্তগামী সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে পল্লী প্রকৃতির পটভূমিকায়।

—মা, মাগো।

চোখ মেলে চায় লালন। কিন্তু দৃষ্টি যেন তার অন্ধকার হয়ে গেছে। তবু অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলে, মাগো, একটু জল। মা—

গ্রামের মধ্যবয়সী জোলা রমণী রহিমা জল ভরতে এসেছে নদীতে। কাঁখে তার মাটির কলসি।

রহিমার কানে আসে অস্ফুট কাতর কণ্ঠস্বর। ফিরে চায় এদিক-ওদিক। তারপর দৃষ্টি যায়—যেখানে লালন নরম পলির শয্যায় শুয়ে আছে।

নরম পলির ওপর দিয়ে খানিকটা নিচে নেমে আসে রহিমা। লালনকে দেখেই শিউরে ওঠে।

—মাগো একটু জল।

লালন দু'চোখ মেলে কী যেন খুঁজে পেতে চায়। হয়তো মায়ের মুখটাই দেখতে চায় সে।

রহিমা পাথর-মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। ভেবেই পায় না, অজ্ঞাত পরিচয় এই রোগাক্রান্ত ছেলেটি এখানে কেমন করে এলো।

—মা, মাগো।

লালনের দুচোখে মাকে খুঁজে পাওয়ার ব্যকুলতা।

রহিমার মধ্যে মায়ের মনটাই তো রয়েছে। কলসিটা মাটির ওপর নামিয়ে রেখে ঝুঁকে পড়ে লালনের মুখের কাছে।

এই মুহূর্তে একটা আবেগ রহিমাকে উতলা করে তোলে। বলে, এই তো আমি।

লালন কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠে। বলে, কই—কোথায় তুমি, দেখতে পাচ্ছি না কেন?

রহিমা আঁজলা ভরে জল দেয় লালনের মুখে। কিন্তু জল পান করারও ক্ষমতা নেই লালনের। দু'কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে জল। তবু যেন একটু স্বস্তি তার জন্যে ছিল।

রহিমা কান্নার আবেগ চেপে রাখতে পারে না। তার দু'চোখ দিয়ে ব্যথার অশ্রু নেমে আসে। তা ছাড়া ভেবেই পায় না, এই মুমূর্ষু ছেলেটিকে নিয়ে কী করবে সে।

হঠাৎ শিঙার আওয়াজে রহিমা সচকিত হয়। এই শিঙার আওয়াজ তার পরিচিত।

ফিরে তাকায় নদী তীরের ভেড়ি পথের দিকে। যে পথ দিয়ে ফকির সিরাজ সাঁই আসছে এই দিকে।

—সাঁইবাবা!

রহিমা আকুল কণ্ঠে ডাকে।

—কীরে, আমি বলেছিলাম না, সিরাজ সাঁই হনহন করে এগিয়ে আসে। বলে, কীরে বলেছিলাম না, তুই তোর ছেলেকে কুড়িয়ে পাবি।

—সাঁইবাবা?

রহিমার বিস্মিত দৃষ্টি সিরাজকে স্পর্শ করে লালনের ওপর নিবদ্ধ হয়।

সিরাজ ততক্ষণে পলিমাটির কাঁদা ভেঙে নেমে এসেছে। ঝুঁকে পড়েছে লালনের মুখের ওপর।

—সাঁইবাবা। রহিমার কণ্ঠস্বরে আকুলতা, আমি কি করবো বলে দাও।

—সামনে মাণিক পড়ে থাকলে কেউ তা ফেলে দেয় রে? সিরাজ সাই হঠাৎ শিঙা বাজাতে আরম্ভ করে। তারপর লালনের মুখের দিকে চেয়ে বলে, এ ছেলে বাজি মাৎ করবে। জানিস, এ ছেলে রাজার রাজা। ফুলের বাসের মত এর নাম ঘর-বার আমোদ করবে। এ হল বেহেস্তের ফুল।

রহিমা ফিরে চায় সিরাজ সাঁই-এর মুখের দিকে।

সাধক ফকির সিরাজ সাঁই। লোকে বলে, সাঁইবাবা। কেউ ডাকে সাঁইজী বলে। সর্বরিক্ত ফকির। না আছে সংসার, না আছে ঘর। গাছ-তলায় তালপাতার টং বেঁধে থাকে। তা-ও বা ক'দিন। বেশির ভাগ সময়ই সে পথে পথে ঘুরে কাটিয়ে দেয়।

রহিমার অগাধ বিশ্বাস সাঁইজীর ওপর। রহিমার কাছে চন্দ্র-সূর্য যেমন সত্যি ; তেমনি সাঁইজী।

সাঁইজীর কথা শুনে তাইতো সে বিস্ময় জড়ানো দৃষ্টিতে ফিরে চায় তার মুখের দিকে।

—কী রে, অমন করে দেখিস কেন আমার দিকে। যাকে দেখার তাকে দ্যাখ। সামনে পড়ে আছে সাত রাজার ধন, আর তুই দেখছিস আমার দিকে।

—কিন্তু!

—কিসের কিন্তু?

—ওর যে দারুণ অসুখ।

এবারে সিরাজ হেসে ওঠে। বলে, সুখ আর অসুখ। ও তো একটা অক্ষরের ব্যাপার। 'অ' বাদ দিলে তো অসুখ বলে কিছু নেই।

রহিমার ছু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। কোনো কথা নেই তার মুখে। শুধু সজল চোখে ফিরে ফিরে দেখছে রোগজীর্ণ লালনের দিকে।

—ওকি! কাঁদছিস কেনে বেটি। চল, ঘরে চল। তোর ছেলের ব্যারাম আমি আরাম করে দেব। নে, চোখের জল মুছে ফেল।

রহিমা আঁচলে চোখ মোছে। তবু কি বন্ধ হয় চোখের জল! নতুন করে তার গণ্ড বেয়ে ব্যথার অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

নদীতীরের পথ পেরিয়ে কিছুটা দূরেই জোলা পল্লী। ছোট ছোট

মাটির ঘর, মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঘরে ঘরে তাঁতশাল। কাপড়-গামছা বোনাই জোলাপল্লীর বাসিন্দাদের পেশা।

পল্লীর একান্তে রহিমাদের জীর্ণ কুঁড়ে। দুটি ছোট দোচালা, গোয়াল ঘর, তাঁতশাল—সামনে একফালি উঠোন পেরিয়ে আম-কাঁঠালের বাগান।

ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক টানছিল মোকসেদ। রহিমার স্বামী।

তামাক ফেলে মোকসেদ নেমে এলো দাওয়ার ওপর থেকে। কার কী হয়েছে! সিরাজ সাঁই আর রহিমা কাকে এমন আড়কোলা করে নিয়ে আসছে।

কাছে এসেই হতবাক বিস্ময়ে মোকসেদ থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু তাকে কোনো কিছুর বলার অবসর দেয় না সিরাজ। বলে, দেখেছো—মাণিক কুড়িয়ে পেলাম।

মোকসেদের মনে তবুও অফুরন্ত বিস্ময়। সাঁইজীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে অবাক দৃষ্টিতে।

—দেখছো কি? সিরাজ বলে, একটু ধরো একে। ঘরে তুলতে হবে তো।

তাঁতশালের পাশে ছোট্ট দোচালা। তারই দাওয়ার চাটাই-ঘেরা খানিকটা জায়গা। সেখানেই লালনের রোগশয্যা রচনা করা হলো।

দারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও লালন যেন কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে। তার মাথার কাছে বসে রহিমা।

লালনের দৃষ্টি অস্বচ্ছ। কোন কিছুই স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে না। তবু বারবার সে দেখতে চায় রহিমাকে। বলতে চায় অনেক কথা, কিন্তু কিছুই বলতে পারে না সে! শুধু অর্ধস্ফুট কণ্ঠে ডাকে, মা।

—এই তো আমি। মাথার কাছেই বসে আছি।

রহিমা হাত বুলিয়ে দিতে চায় লালনের মাথায়। কিন্তু হাত বোলাবে কেমন করে। সারা মুখে, মাথায় বসন্তের ক্ষত।

লালন পাশ ফিরে কাত্ হয়ে শোয়। একখানি হাত তুলে দেয় রহিমার কোলে।

রহিমার দুটি চোখ নতুন করে জলে ভরে ওঠে। সজল চোখে চেয়ে থাকে লালনের মুখের দিকে।

দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে লালন। ঘুমের মধ্যেও তার মৃদু কাতরানি।

কোলের ওপর থেকে লালনের হাতখানি নামিয়ে রেখে রহিমা উঠে আসে ঘরের দাওয়ায়। যেখানে সাঁইবাবার সঙ্গে গল্পে মেতেছে মোকসেদ।

কী মনে হলো রহিমার, দাওয়া থেকে নেমে এলো উঠোনে।

আকাশে পূর্ণ চাঁদের আলো। রহিমা ফিরে তাকালো আকাশের চাঁদের দিকে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে চাঁদের আলোয় অবগাহন করলো রহিমা।

রাত গভীর।

লালন ঘুমিয়ে পড়েছে। রহিমা জেগে আছে তার শিয়রে। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ সিরাজ সাঁই। দাওয়ার কোণে একটা ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে শুয়ে আছে।

সিরাজ সাঁই-এর-ও চোখে ঘুম নেই। চুপচাপ শুয়ে আছে নক্সিকাঁথার ঝোলাটা মাথায় দিয়ে।

আর লালন! ঘুমে অচেতন সে। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও তার অবচেতন মন জেগে আছে। স্বপ্ন দেখছে সে মন। সমুদ্রের স্বপ্ন। দেখছে একটা বিরাট দৈত্যের মতো ঢেউ যেন ছুটে আসছে বেলাভূমির দিকে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সে।

একই স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি দয়াবতীর চোখে।

স্বপ্ন-কল্পনায় দয়াবতী যে সমুদ্রের ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছিল, সেই স্বপ্নের সমুদ্রটা যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে।

বিরাট ঢেউগুলো গর্জন করে ছুটে আসছে। যেন এই মুহূর্তে সব কিছুকে গ্রাস করবে।

স্বপ্নের মধ্যেও অস্থির হয়ে ওঠে দয়াবতী। তারপর আর্তকণ্ঠে চাপা চিৎকার করে ওঠে।

—কী হলো বৌমা!

পদ্মাবতীর ঘুম ভেঙে যায় দয়াবতীর চাপা আর্তনাদে।

—মা!

উঠে বসে দয়াবতী। জড়িয়ে ধরে পদ্মাবতীকে। বলে, ভীষণ ভয় করছে মা।

—ভয়! কীসের ভয়।

—স্বপ্নে দেখলাম, সে দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের ধারে, আর—কথা শেষ হয় না। এই মুহূর্তে বাইরের দরজায় করাঘাত ওদের সচকিত করে গেলে।

—কে! লালন এলি?

পদ্মাবতী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

লালন নয়, তার সহযাত্রীরা ফিরে এসেছে। তাদের মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পদ্মাবতীর বুকটা যেন কেঁপে ওঠে। বলেন, তোরা অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? কী হয়েছে বল! লালন কোথায়?

—লালন নেই।

—নেই!

পদ্মাবতীর দু'চোখে যেন অন্ধকার নামে। পায়ের নিচের মাটি সরে যায়। লালন—বলে বুক ফাটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়েন দরজার চৌকাঠের ওপর।

—মা, মাগো—

আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে দয়াবতী।

মা-বৌ-এর কান্নায় রাতের গভীর নীরবতা ভেঙে যায়।

দুঃসহ স্বপ্নের মধ্যে ঘুম ভেঙে যায় লালনের। স্বপ্ন জড়ানো দুটি চোখে কী যেন খুঁজে পেতে চায়।

মাথার কাছে বসে রহিমা। প্রদীপের আলো এসে পড়েছে রহিমার মুখের ওপর। হয়তো-বা রহিমার মুখ অস্পষ্ট হয়ে লালনের চোখে প্রতিবিম্বিত হয়।

—মা, মাগো।

—কী, কষ্ট হচ্ছে বাবা।

লালন এখনো কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কোনো কিছুই ভাবতে পারছে না সে। সব কিছুই তার কাছে দুর্বোধ্য। তবুও বলে, আমার কী হয়েছে মা। আমি কিছু বুঝতে পারছি না কেন?

রহিমা বলে, তুমি ঘুমোও বাবা।

—ঘুম যে আসছে না। লালন কাতরকণ্ঠে বলে, আমার কি হয়েছে

মা, কিছু ভাবতে পারছি না, কিছু বুঝতে পারছি না। আমি যেন সব কিছুর খেই হারিয়ে ফেলছি।

বলতে বলতে উতলা হয়ে ওঠে লালন। মাথা তুলতে চেষ্টা করে। পারে না। শেষটা শুধু দু'চোখে দেখতে চায় রহিমাকে।

অস্বচ্ছ দৃষ্টি লালনের সব কিছু তার কাছে অস্পষ্ট। তবু সে রহিমার অস্পষ্ট মুখের মধ্যে তার মায়ের মুখ খুঁজে পেতে চায়।

আর রহিমা।

লালনের এই দুঃসহ অবস্থা সহ্য করতে পারে না যেন। অথচ এই মুহূর্তে কিছু বলতেও পারে না সে।

—মা।

লালন একটা হাত রহিমার কোলের ওপর ছড়িয়ে দেয়।

তবু রহিমার মুখে কথা নেই। শুধু অব্যক্ত আবেগে তার ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে।

—তুমিই তো আমার মা! লালনের কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে, আমি তো তোমার কাছেই আছি, না মা?

রহিমা নীরব।

—আমাকে একটু তুলে ধরবে মা?

রহিমা দু'হাতে তুলে ধরে লালনকে। কিন্তু উঠে বসবার ক্ষমতা নেই লালনের। তার মাথাটা নুয়ে পড়ে রহিমার কোলের ওপর।

কয়েকটা দিন কেটে গেছে।

ক'দিনে কিছুটা সুস্থ হয়েছে লালন। ক্ষত শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষতচিহ্ন গুলো ছড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে।

সেদিন।

বাইরের দাওয়ায় বসে আছে লালন। চেয়ে আছে সামনের পথের দিকে।

কিন্তু দৃষ্টি তার অস্বচ্ছ। তবুও দৃষ্টিটাকে দূরে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে।

শিঙার আওয়াজ ওঠে। লালন সচকিত হয়।

ফকির সিরাজ সাঁই শিঙা বাজাতে বাজাতে এদিকেই আসছে।

—এই যে বেটা। সিরাজের মুখে মৃদু হাসি। লালনকে দেখেই একটা

গানের কলি গেয়ে ওঠে। তারপর মৃদু হাসি মিশিয়ে বলে, কী আজগুবি ব্যাপার! ছিলি কোথায়, আর এলি কোথায়?

লালন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সিরাজের মুখের দিকে।

সিরাজ আরো কাছে এগিয়ে আসে। লালনের সামনে দাওয়ার মাটির ওপরেই বসে পড়ে। বলে, কি দেখছিস রে? আমারে!

লালনের মুখে তবুও কোনো কথা নেই। সে একই ভাবে তাকিয়ে আছে সিরাজের মুখের দিকে।

সিরাজের মুখে সেই একই সুরের হাসি। বলে, আমারে দেখে কী করবি? ওই দু'চোখের আরশিটা কি আমারে দেখবি বলে।

এবারেও লালন নীরব।

সিরাজ আবার বলতে আরম্ভ করে, এই ছোট্ট দুটো চোখ, তার ছোট্ট দুটো মণি। যে মণির আলোয় ত্রিজগত দেখি। জগতের বাইরে আরো জগত দেখি। খোদার কি আজব কারবার।

লালন অবাক হয়ে শোনে সিরাজ সাঁই-এর কথা।

আরো কত কথা বলে যায় সিরাজ। তারপর একসময় কথার শেষে গেয়ে ওঠে

'মেরে সাঁই-র আজব লীলাখেলা
তা কেউ বুঝতে পারে।'

গান শেষ হতে এক নাগাড়ে শিঙা বাজাতে আরম্ভ করে লালন। তারপর নিজের খেয়ালেই দাওয়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে। উঠোন পেরিয়ে বাগানের পথ ধরে হনহন করে চলে যায়।

লালন অবাক চোখে চেয়ে থাকে সাঁইবাবার চলার পথের দিকের। দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে চলে যায় সাঁইবাবা। লালন তারপর মনে মনে সেই বিচিত্র স্বভাবের মানুষটির কথাই ভাবে, যত ভাবে মনের মধ্যে বিস্ময় ততো গভীর হয়।

সুস্থ হয়েছে লালন। তবে শরীরের দুর্বলতা এখনো কাটেনি। মিলিয়ে যায়নি ক্ষত চিহ্নগুলো। এ ছাড়া একটি চোখের দৃষ্টিও নষ্ট হয়ে গেছে।

এরই মধ্যে একদিন।

লালন এসে বসেছে নদীর ধারে। অনেকদিন পর আজ আবার বাঁশের বাঁশী হাতে নিয়েছে।

নদীর পাড়ে নির্জনে বসে বাঁশীতে পুরোনো সুর নতুন করে বাজাতে চেষ্টা করলো লালন। কিন্তু পারলো না। সুর ফুটে উঠতে না উঠতে হারিয়ে গেল।

তবুও বাঁশী হাতে বসে রইলো সামনে নদীর বুকের দিকে তাকিয়ে।

এ নদী কোথায় গেছে!

এ নদীর নাম কি?

এই নদীর ধারাই তো গৌরী নদীর ধারায় মিশেছে।

এই মুহূর্তে দূর থেকে ভেসে এলো ভাটিয়ালী গানের সুর। একটা পালতোলা নৌকো ভেসে আসছে মাঝদরিয়া বরাবর। ভেসে আসছে মাঝির কণ্ঠের ভাটিয়ালী সুরের গান। স্পষ্ট সুর, কিন্তু অস্পষ্ট ভাষা।

আবার বাঁশীতে সুর তুলতে চেষ্টা করে লালন। কিন্তু এবারেও সুর বেসুরো হয়ে ওঠে। মন তার বাঁশীতে নেই। চলে গেছে অনেক দূরে গৌরী নদীর ধারে গ্রামের সেই ছোট্ট কুটিরে। যেখানে অপেক্ষা করে আছে দয়াবতী, যেখানে তারই প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন মা পদ্মাবতী।

দয়া।

দয়াবতীর ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ভাসে লালনের মনের পর্দায়, কখন অন্যমনে দয়ার নামও উচ্চারণ করে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে।

লালনের দু'চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে পড়ে। উঠে দাঁড়ায় সে। ফিরে তাকায় ভরা নদীর দিকে, তারপর গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ফিরে আসে বাড়ি, যেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে রহিমা।

রহিমা বসেছিল দাওয়ার খুঁটি ঠেস দিয়ে, দৃষ্টি ছিল পথের দিকে।

লালন আসছে দেখেই রহিমা উঠোনে নেমে আসে, বলে, এই দুর্বল শরীর নিয়ে কি বেড়াতে আছে বাবা?

লালনকে কেমন যেন উন্মনা মনে হয়, কথা বলে না, শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রহিমার মুখের দিকে।

রহিমা বলে, অমন করে কি দেখছিস?

—তোমাকে দেখছি মা। লালন উতলা কণ্ঠে বলে, কিন্তু তেমন করে দেখতে পাচ্ছি কই, একটা চোখ যে অন্ধকার হয়ে গেছে। যে চোখটা আছে, সেটিতেও তো তেমন আলো নেই। আমি যে অন্ধ হয়ে গেলাম মা।

রহিমা বলে, ও কথা বলতে নেই রে। কই—দেখি, কাছে আয়।

রহিমার কাছে এগিয়ে আসে লালন। বলে, আমার চোখে তুমি কি দেখবে, আমি তো বুঝতে পারি, একটা চোখ আমার অন্ধ হয়ে গেছে।

আর দাঁড়ায় না লালন। হনহন করে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে। রহিমা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে অচঞ্চল।

স্বামী মোকসেদের কণ্ঠে চমক ভাঙে রহিমার। রঙ করা সুতো টানা দিচ্ছে মোকসেদ।

—আমায় ডাকছো?

—হ্যাঁ। মোকসেদ বলে, এদিকে এসো। একা একা সুতো টানা দেওয়া যায় না।

রহিমা এগিয়ে আসে স্বামীর কাছে। লালনের কথা ভাবতে তার চোখে জল এসেছিল। ভুলে গেছে চোখের জল মুছতে।

মোকসেদের দৃষ্টি এড়ায় না রহিমার চোখের জল। একটু সুর টেনে বলে, বনের চিড়িয়া পোষ মানে না। ফাঁক পেলেই ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাবে।

—আমি তো ওরে খাঁচায় আটকাতে চাইনি। বলে আঁচলে চোখ মোছে রহিমা!

—তবে? মোকসেদ জানতে চায়, তবে কি চাও?

—সে তোমারে বোঝাতে পারবো না।

—যাক, আর বোঝাতেও হবে না। সুতোর মুখটা ধরো। মোকসেদ সুতো টানতে টানতে দূরে সরে যায়। বলে, দ্যাখো—অনেক দুঃখ আছে তোমার কপালে।

সুতোর একটা মুখ ধরে রেখেছিল রহিমা। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সুতোর মুখটা হাত থেকে খসে যায়।

মোকসেদ একটু বিরক্ত হয়। বলে, থাক—ঢের হয়েছে। আর সুতো ধরতে হবে না।

রহিমা তবুও সুতোর মুখটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নেয়। মোকসেদ সুতো টানতে টানতে দূরে চলে যায়।

নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়ায় লালন। বলে, তুমি যাও মা, আমি বরং সুতো ধরছি।

রহিমাকে কিছু বলবার অবসর দেয় না লালন। সুতোর মুখটা নিজের হাতে ধরে। বলে, এই তো কাজ—এ আমি পারবো।

রহিমা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায়।

—দুটো মানুষ দুদিকে, মাঝে একটা সুতোর যোগ। কী মজার কারবার রে বাবা?

খিড়কির দরজা দিয়ে হনহন করে উঠোন পেরিয়ে ফকির সিরাজ সাঁই এসে দাঁড়ায় লালনের পাশে। জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছিস রে বেটা?

—আছি ভালোই। তবে—

লালন কথা শেষ করতে পারে না।

সিরাজ মৃদু শব্দ করে হাসে। তারপর লালনের পিঠে মৃদু চাপড় মেরে বলে, বুঝতে পেরেছি রে। ফকির হয়েছি বলে, বোধশক্তিটা হারিয়ে ফেলিনি। সব বুঝি রে। পেছনটা তোরে টানছে—না রে? টানবে বৈকি। সুতোর যোগ রয়েছে। তা'য় আবার যেমন-তেমন সুতো নয়। না রে?

লালন মাথা নিচু করে। ভাবে, তবে কি সাঁইজী তার মনের কথা শুনতে পেয়েছে!

সিরাজ আবার নিজে থেকেই বলে, বেশ তো—ঘুরে আয় না।

লালন ফিরে তাকায় সিরাজের মুখের দিকে।

সিরাজ তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলে, হাঁ করে দেখছিস কী? যা বলবি বল? গ্যাখ, কথা কখনো চেপে রাখিসনি। যা মনে আসে, তাই বলবি। মনের মধ্যে কথা পুষে রাখলে, দিনকতক বাদে দেখবি মনটা পঙ্গু হয়ে গেছে।

বলে আর দাঁড়ায় না সিরাজ। উঠোন পেরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। চিৎকার করে রহিমার নাম ধরে ডেকে বলতে থাকে, কই রে, ছেলে পেয়ে কি তোর সাঁইবাবারে ভুলে গেলি?

রহিমা ঘরেই ছিল। সাঁইবাবার সাড়া পেয়েই বাইরে আসে। দাওয়ার কোণে চাটাই বিছিয়ে দিয়ে বলে, তোমারে আমি ভুলতে পারি সাঁইবাবা?

—তা জানি রে বেটি। ঝোলাঝুলি নামিয়ে রেখে সিরাজ জমিয়ে বসে চাটাই-এর ওপর। বলে, নে, ভালো করে এক ছিলিম তামাক সাজ তো।

ওদিকে হাতের কাজ সারা হলে মোকসেদ গোয়াল ঘরের দিকে যায়। লালন এসে বসে সাঁইজীর পাশে।

সাঁইজী বলে, ও সব সুতো ধরা কি তোর কাজ? ও সব করবে ওই মোকসেদরা। যাকগে, আজ আমি তোর বাঁশী না শুনে উঠবো না। আজ শুনবো তোর বাঁশী কেমন সুরে বাজে। যা, নিয়ে আয় তোর বাঁশী।

লালন প্রথমটা ইতস্ততঃ করে। কিন্তু সিরাজ নাছোড়বান্দা। শেষটা আর 'না' করতে পারে না লালন।

বাঁশের বাঁশীতে ফুঁ দিলো লালন। বাঁশীটা প্রথমটা যেন ককিয়ে উঠলো। তারপর ঠিক মতো বাজতে আরম্ভ করলো বাঁশী।

সিরাজ অবাক হয়ে শোনে লালনের বাঁশী। শুনে মুগ্ধ হয়। তারপর সুর নেমে যেতে আচমকা জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে, তুই গান বাঁধতে পারিস নে?

—গান!

—হ্যাঁ, তোর বাঁশীতে এত সুর, আর গান বাঁধতে পারবি না?

লালন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সাঁইবাবার মুখের দিকে। সিরাজের মুখ হাসির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অনুচ্চকণ্ঠে বলতে আরম্ভ করে, আমি তোকেই চেয়েছিলাম রে। তুই আমার, আমি তোর। আমরা দুজনে একই খেয়ায় পাড়ি দেবো দরিয়ায়। হাল থাকবে না, দাঁড় থাকবে না—ভেসে যাবো স্রোতের টানে।

বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সিরাজ সাঁই। আত্মগত সুরে বলে চলে, আমি জানি—আমি যা পারিনি, তুই তা পারবি। আমি তোর মধ্যে সেই মানুষটারে দেখতে পেয়েছি। যে মানুষটারে এতকাল আমি পাগলের মতো খুঁজে বেড়িয়েছি।

—কে সে!

লালনের কথায় যেন চমকে ওঠে সিরাজ। 'কে সে?'—একথার কি উত্তর দেবে!

দুচোখ বন্ধ করে সিরাজ কী যেন ভাবে। তারপর কথা না বলে দুহাতে জড়িয়ে ধরে লালনকে।

লালন কেমন যেন অভিভূত হয়ে যায়।

রাতে।

ঘুম নেই লালনের চোখে। তন্দ্রা আসছে, কিন্তু বারবার সে তন্দ্রা টুটে যাচ্ছে। মনে পড়ছে সিরাজ সাঁই-এর কথা। কথাগুলো যেন মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গেছে।

একসময় বিছানা ছেড়ে উঠে এলো লালন। খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলো খানিক সময়। জানালার পথে তাকিয়ে রইলো বাইরের পটভূমিকায়। তারপর একসময় ফিরে এলো শয্যায়।

রাত শেষ হয়ে আসছে।

ঘুম-ঘুম তন্দ্রায় আচ্ছন্ন লালন। তন্দ্রাতুর মনের মধ্যে এক স্বপ্ন-চিন্তা।

মনের পর্দায় স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে গৌরী নদীর পারে সেই জীর্ণ কুটিরের ছবি। যে কুটির অঙ্গনে তার প্রতীক্ষায় বসে আছেন মা।

মায়ের পরনে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র' শরীর শীর্ণ—কালিমায় ঢাকা। দৃষ্টি নিষ্প্রভ—ব্যথাতুর।

—মা! মা!

তন্দ্রার মধ্যেও লালনের আর্ত কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে ফোটে। আপন কণ্ঠস্বরে আপনি চমকে ওঠে লালন। উঠে বসে শয্যায়।

মাথার কাছের জানলা ছিল খোলা। একটুকরো চাঁদেব আলো এসে পড়েছে জানলা দিয়ে।

খোলা জানালার দিকে ফিরে তাকিয়ে আপন মনে বলে, মা—আমি তোমার কাছে যাবো মা।

আরো কিছুক্ষণ খোলা জানলার ধারে অচঞ্চল দাঁড়িয়ে রইলো লালন। তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে আসে।

শেষ রাতের অন্ধকার জড়ানো চারদিক! শুধু পুব আকাশে আলোর আভাস।

পিছনে ফিরে তাকায় লালন। কেউ কোথাও নেই। শুধু নেড়ি কুকুরটা উঠোনের কোণে খড়ের গাদার ওপর শুয়ে আছে।

আর দাঁড়ায় না লালন। উঠোন পেরিয়ে বাগানের পথ'ধরে চলতে আরম্ভ করে।

পল্লীর পথ পেরিয়ে নদীর ধারের পথ ধরলো লালন। খেয়াঘাটের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো। এখনো খেয়া পারাবার শুরু হয়নি।

—কিরে, সাত সকালে কোথায় যাচ্ছিস রে?

সচকিত লালন ফিরে তাকায় সিরাজ সাঁই-এর কণ্ঠস্বর শুনে।

—সাঁইজী!

—কেন, চিনতে পারছিস নে? সিরাজের মুখে মৃদু হাসি। বলে, পালিয়ে যাচ্ছিস বুঝি?

লালন নিরুত্তর।

—কিন্তু যাবি কোথায়?

—মায়ের কাছে, লালনের কণ্ঠস্বর অনুচ্চ, আমি আবার ফিরে আসবো সাঁইজী।

সিরাজ হাসলো।

—তোমার কথা আমি কোনদিন ভুলবো না সাঁইজী।

—ওরে, তুই পাকা মানুষ হয়ে এমন কাঁচা কথা বলছিস? আমার কথা ভুলবি নে সে কি কথার কথা। মানুষকে যে ভবের কথা ভুলতে হয় রে। আমিই বা কে, তুই-ই বা কে। কেউ কিছু না। বিলকুল ফাঁকা। এই যে দুনিয়া—তাও ভেসে বেড়াচ্ছে শূন্যে। এই শূন্যের মধ্যে যেটুকু বাঁধন তা হলো মায়ার। ওই বাঁধনটুকু আছে বলেই আমরা ঘুরে মরছি। এটুকু—সেটুকু বাঁধন যেদিন ছিঁড়বে—

কথা শেষ না করে আচমকা শিঙা বাজাতে আরম্ভ করে সাঁইজী।

—সাঁইজী!

—যাওয়া আসার পথ একটাই। যে পথে যাওয়া, সেই পথেই আসা। তুই যাচ্ছিস সে জন্যে আমার দুঃখ নেই রে। আমি ভাবছি, অনেক দুঃখ পেয়ে তোকে ফিরতে হবে।

কথার মধ্যে খেয়াপারের ডিঙি এসে ঘাটে ভিড়লো।

সিরাজ বলে, যা—আর দেরি করিস নে। প্রথম খেয়ায় পার হয়ে যা।

—সাঁইজী!

—কি।

—আমার নতুন মাকে বুঝিয়ে বোলো, বলবে তো?

সিরাজ মৃদু হেসে বলে, একটা কথা শোন, সব সময়ে পথ চলবি সামনে

নজর রেখে। পিছে কি আছে না আছে নাইবা দেখলি, যা—যাবি যখন, আর দেরি করিস নে। তোকে আজ পারের খেয়ায় তুলে দিয়ে যাচ্ছি—আবার যখন এপারে আসবি, তখন কেউ না থাকে, আমিই ঘাটে বসে থাকবো তোর জন্যে।

—সাঁইজী!

লালনের দু'চোখ ছল ছল করে ওঠে।

—ওকি রে! তোর চোখ ছলছল করছে কেন? নদীতে এত জল, ও-টুকু চোখের জলে কি হবে রে। যা—আর দেরি করিস নে।

ভাঁটার টানে জল অনেকখানি নেমে গেছে। পলিমাটির কাদা ভেঙে লালন ডিঙিতে ওঠে।

প্রথম খেয়ায় একা যাত্রী সে।

ডিঙি ভাসছে নদীর জলে, দাঁড় টানছে মাঝি।

লালনের দৃষ্টিটা তখনো ঘাটের দিকে। যেখানে সিরাজ সাঁই দাঁড়িয়ে আছে।

পারে দাঁড়িয়ে একভাবে হাত নাড়ছে সিরাজ।

ডিঙি তখন মাঝনদীতে সিরাজ সাই হাত নাড়া বন্ধ করে শিঙা বাজাতে আরম্ভ করলো।

পারে এলো খেয়া-ডিঙি। লালন ডাঙায় নামলো। তাকালো ওপারের দিকে।

সিরাজ সাঁই তখনো দাঁড়িয়ে আছে। এপার থেকে তাকে পুতুলের মতো মনে হয়।

ওপারে সিরাজ।

এপারে লালন।

সিরাজ নদী পাড়ের পথ পেরিয়ে গ্রামের পথ ধরে।

আর লালন নদী তীরের পথ ধরে এগিয়ে চলে দূর গ্রামের দিকে।

বেলা দুপুর।

এবারে আর নদীতীরের পথ নয়, গ্রামের পথ ধরে লালন। একটানা পথ হেঁটে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে চলে সে। চলতি পথে তার কণ্ঠে জাগে গানের সুর।

সারাদিন গেল। সন্ধ্যে হলো পথে।

পথ এসে মিশেছে পথের সঙ্গে। পথের মোড়ে একটা মুদির দোকান।

মুদির দোকানির কাছে লালন জানতে চায় গ্রামের নিশানা, ভাঁড়ারা আর কত দূর ?

মুদি বলে, সে তো অনেক দূর। পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।

হোক রাত, সারা রাত কেটে যাক পথে পথে, তবুও কোথাও থামবে না সে। মায়ের কাছে না পৌঁছনো পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

একটানা পথ হেঁটে ক্লান্ত লালন। তবুও চলায় বিরাম নেই। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর দেহ—তবু দু'দণ্ড দাঁড়াবার অবসর নেই। মনে তার, একটি চিন্তা—কতক্ষণে পৌঁছবে গ্রামে !

গভীর রাত।

ঘুমিয়ে আছে গ্রাম। পল্লী।

গ্রামের পথে পা দিয়েই লালন মাথায় তুলে নেয় পথের ধুলো। এক অব্যক্ত আবেগ তার চেতনাকে যেন বিবশ করে তোলে। অস্ফুটকণ্ঠে বলতে থাকে, মা—মাগো—মা—

পরমুহূর্তে আবার শুরু হয় তার পথ চলা। পরিচিত পথ, পরিচিত পরিবেশ, তবুও লালনের মনে হয়, এখানে সে যেন অপরিচিত অতিথি।

চেনা পথ ধরে বাড়ির কাছে আসে লালন।

বাড়ির কাছে এসেই মনে মনে কেমন উতলা হয়ে ওঠে। পাগলের মতো চিৎকার করে ডাকে, মা—মা—মা।

লালনের ডাক যেন স্বপ্নের মতো মনে হয় পদ্মাবতীর। কতো স্পষ্ট কণ্ঠস্বর, তব মনে হয়, যেন এ-এক অসম্ভব স্বপ্ন।

দয়াবতীরও ঘুম ভেঙে গেছে। স্পষ্ট শুনেছে সে স্বামীর কণ্ঠস্বর। বিছানা ছেড়ে উঠে সে-ও ডাকে, মা, মা—

উঠে বসেন পদ্মাবতী। লালনের কণ্ঠস্বরটা আবার কানের কাছে বাজে। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। বলেন, বৌমা—আমি কি পাথর হয়ে গেলাম ! উঠতে পারছি না কেন ? বৌমা—

বাইরে থেকে আবার উচ্চ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, মা—মা।

এবারে কোনমতে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ান পদ্মাবতী, আলুথালু হয়ে ছুটে যান দরজার দিকে।

দরজা খুলেই সামনে লালনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আর্ত কান্নায় ভেঙে পড়েন।

হয়তো মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন পদ্মাবতী। কিন্তু লালন তার আগেই দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে মাকে।

—মা, মাগো। লালনের কণ্ঠে বিস্ময় মেশানো, কি হলো মা। আমি লালন, ফিরে এসেছি তোমার কোলে।

ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে আসে পদ্মাবতীর। ফিরে তাকান লালনের মুখের দিকে। সেই মুখ, সেই চোখ—যেটুকু পরিবর্তন, বাইরের। শুধু ক্ষত চিহ্ন ছড়িয়ে আছে সারা মুখে। আর একটি চোখের তারা কেমন যেন ঘোলাটে।

পদ্মাবতী আস্তে আস্তে হাত বুলোতে আরম্ভ করেন লালনের চোখে-মুখে। কি যেন বলতে চান, কিন্তু কণ্ঠস্বর ভাষা হয়ে ফোটে না। দু চোখ তাঁর জলে ভরে আসে। আর ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকে থর থর করে।

· মা!

লালনের দৃষ্টি যায় ঘরের দিকে। যেখানে দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছে দয়াবতী। পরনে যার বিধবার বেশ।

পাগলের মতো ঘরের মধ্যে ছুটে যায় লালন। দু'হাতে তুলে ধরে দয়াবতীর চিবুক।

—দয়া! তোমার সিঁথির সিঁদুর কোথায় গেল! তোমার এ বেশ কেন?

লালনের মুখ থেকে জিজ্ঞাসা শোনার পরেও দয়াবতী জড়ের মতো বসে রইলো স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে। তার যেটুকু প্রাণের সাড়া, তা যেন দুফোঁটা চোখের জলে।

—দয়া! কথা বলছো না কেন?

দয়াবতী তবুও নিরুত্তর।

—তুমি কি কথা বলতে ভুলে গেছো? চাপা আর্তনাদের মতো শোনায় লালনের কণ্ঠস্বর।

—দেখছো না, আমি কাঁদতেও পারছি না। দেখছো না—

কথা শেষ করে না দয়াবতী। স্বামীর বুকে মাথা গুঁজে বোবা কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে ওঠে।

—দয়া, তুমি এ সাজে সেজেছো কেন ?

দয়া নীরব।

—চুপ করে থেকো না দয়া। বলো, কী হয়েছে তোমার ? কে তোমাকে এমন সাজে সাজালো ?

এবারেও দয়ার মুখে ভাষা ফোটে না। শুধু স্বামীর মুখের দিকে ফিরে তাকায় সজল চোখে।

লালন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দয়ার মুখের দিকে। দয়াবতীর সজল চোখের তারায় লালনের মুখের প্রতিবিম্ব ভাসে।

গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে লালন। বলে, আমি সব বুঝতে পেরেছি।

—ওগো, এ আমার কী হলো !

এবারে অশান্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে দয়াবতী।

লালনের মনেও অস্থির যন্ত্রণা। তারও দু'চোখে জলের চিহ্ন। তবুও সে দয়ার মুখখানি দু হাতে তুলে ধরে বলে, দয়া—আমি রক্ত দিয়ে রাঙিয়ে দেবো তোমার সিঁথি। নিজে কেঁদে আর আমাকে কাঁদিয়ো না। লক্ষ্মীটি, আমি তো ফিরে এসেছি।

তবুও দয়াবতীর কান্না থামে না।

—কই, চোখের জল মুছে ফেলো দয়া।

বলে লালন নিজেই দয়াবতীর চোখের জল মুছিয়ে দেয়।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত কাটে। তারপর দয়াবতীর কণ্ঠে অনুচ্চ জিজ্ঞাসা ফোটে, আমার এ স্বপ্ন ভেঙে যাবে না তো ?

—স্বপ্ন ! এতর মধ্যেও লালনের মুখের রেখাগুলো যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, আজ এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই।

দয়াবতীর বুকের ভিতর থেকে গভীর নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

পদ্মাবতী তখনো দরজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। এবারে লালন উঠে আসে মায়ের কাছে। বলে, মা—তুমি অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? কত দিন পর। তোমার লালন ফিরে এলো, তাকে নিয়ে কোথায় আনন্দ করবে, তা নয়—শুধু কান্না আর কান্না। মা—তোমরা এতো বদলে গেলে কেন ?

পদ্মাবতী নিরুত্তর।

লালন অনুচ্চকণ্ঠে ডাকে, মা।

পদ্মাবতীর দৃষ্টি লালনের মুখের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে।

লালন বলে, দয়ার ওই সাজ দেখে আমি সবই বুঝতে পেরেছি মা।

—লালন, তুই আমার দুঃখ বুঝবি নে। আমি নিজের হাতে বৌমার হাতের শাঁখা ভেঙেছি, নিজে মুছিয়ে দিয়েছি ওর সিঁথির সিঁদুর। এতো বড়ো পাপ করার পরেও আমি বেঁচে আছি।

কথাগুলোয় পদ্মাবতীর বুক যেন ভেঙে যায়।

—মা, লালন বলে, তুমি কেন পাপের কথা বলছো। তুমি আমার মা, তোমাকে কি কোনো পাপ স্পর্শ করতে পারে?

—তুই জানিস নে, আমি কি পাপ করেছি। জানিস নরকেও আমার জায়গা হবে না।

—ও সব কথা থাক মা? এবারে আমার কথা শোনো।

পদ্মাবতী অশান্ত আবেগে বুকে টেনে নিলেন লালনকে। তারপর কান্না জড়ানো স্বরে বলেন, কোনো কথা নয় রে লালন—তোকে ফিরে পেয়েছি এই তো শেষ কথা।

—মা! লালনের কণ্ঠস্বর অনুচ্চ। বলে, কিন্তু একজনের কথা না বলে যে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। যে তোমার সন্তানের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। জানো মা, তাকে আমি নতুন মা বলে ডাকতাম।

—নতুন মা!

পদ্মাবতীর চোখে-মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। এবারে লালন বলে যায় আনুপূর্বিক ঘটনার কথা।

পদ্মাবতীর মুখের রঙ বদলে যায়। লালনও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে।

ঠিক এই মুহূর্তে বাইরে থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। পড়শীরা এসেছে কান্না শুনে।

পদ্মাবতীর বুক কেঁপে ওঠে অজানা শঙ্কায়। চুপিস্বরে বলেন, লালন—তুই যে মুসলমানের বাড়িতে ভাত জল খেয়েছিস, একথা যেন ওরা জানতে না পারে। ওরা জানতে না পারে, তুই মুসলমান মেয়েকে মা বলে ডেকেছিস।

—কেন মা ?

—চুপ কর।

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন পদ্মাবতী, কিন্তু চুপ করে গেলেন দরজা চৌকাঠের কাছে প্রতিবেশিনীদের দেখে।

একজন তো আচমকা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। সামনে লালনকে দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো।

—ওমা! কী সব্যনেশে ব্যাপার গো। চিৎকার করে উঠলো আর একজন বর্ষীয়সী রমণী।

– দিদি। পদ্মাবতী বোঝাতে চেষ্টা করেন, দেখছো কি, ও আমার লালন। ফিরে এসেছে। আমার লালন মরে যায়নি। ওরা মিথ্যে বলেছিল দিদি।

কে কার কথা শোনে। পড়শী মহিলা, যারা ঘরের বাইরে ছিল—ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সবাই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে লালনকে।

এরপব নানা মুখে নানা মন্তব্য শোনা যায়। লালন অবাক হয়ে যায় সে সব কথা শুনে। কোথায় সে ফিরে এসেছে জেনে সবাই আনন্দ করবে তা নয়—কেবল আজেবাজে কথা। ইচ্ছে হয় প্রতিবাদ করে এ সব কথার। কিন্তু কিছু না বলে নিঃশব্দে একান্তে এসে দাঁড়ায়। ভাবে, না জানি ঘটনার গতি তাকে কোথায় নিয়ে যাবে।

লোক মুখে খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না।

লালন ফিরে এসেছে—খবর শুনে রাত থাকতেই সারা গ্রামের মানুষ ভিড় করেছে লালনের বাড়ির উঠোনে।

কোনো কথাই গোপন নেই। লালন মুসলমানের ঘরে অন্ন-জল গ্রহণ করেছে, জোলা রমণীকে মা বলে ডেকেছে—এ খবরও কারো অজানা নেই।

লালন আচার ভ্রষ্ট, ধর্ম ভ্রষ্ট—সুতরাং সমাজে তার স্থান নেই। তার ছায়া স্পর্শ করাও পাপ।

নানা কথার গুঞ্জন ওঠে নানা মুখে। লালন ভিড়ের মধ্যে থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

মা পদ্মাবতী ঘরের কোণে জড়ের মতো বসেছিলেন। লালন আশ্রয় চায় মায়ের বুকে।

—মা !

পদ্মাবতীর ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে। একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারেন না।

—মা।

পদ্মাবতী তবুও নীরব।

—মা, লালনের কণ্ঠে কাতর জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে, চুপ করে থেকো না মা, বলো—সত্যি, কি আমার ধর্ম চলে গেছে ?

পদ্মাবতীর মুখে তবু কোনো কথা নেই। শুধু ভাষাহীন দৃষ্টিতে লালনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

লালন আর দাঁড়ায় না। যায় দয়াবতীর কাছে।

ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে আছে দয়াবতী। লালন আস্তে আস্তে দয়ার মাথার কাছে বসে। জিজ্ঞাসা করে, তুমি কিছু বলবে না দয়া ?

দয়াবতী আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে।

লালনের কণ্ঠস্বরও সিক্ত হয়ে ওঠে। বলে, আমি জানি দয়া, সবাই আমাকে ত্যাগ করলেও তুমি আমাকে ত্যাগ করবে না। দয়া, চলো—তুমি আর আমি চলে যাই অন্য কোথাও, অন্য কোন দেশে। যেখানে আমাদের সমাজ নেই, ধর্ম নেই।

দয়া এবারে উঠে বসে। বলে, কোথায় যাবো ?

—অনেক দূর। যেখানে কোন চেনামুখ নেই।

—কিন্তু মা ! মাকে ছেড়ে কোথায় যাবো ?

এতো দুঃখের মধ্যে লালনের মুখে হাসি ফোটে। আবার মায়ের কাছে যায়। শান্ত কণ্ঠে ডাকে, মা।

পদ্মাবতী ফিরে তাকান ছেলের মুখের দিকে।

বাইরে থেকে তখনো নানা জনের নানা মন্তব্য ভেসে আসছে। সে সব কথা কানে নেয় না লালন। বলে, মা—একবার আমার কথাটা শোনো।

পদ্মাবতী যেন পাথর হয়ে গেছেন। যেন কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে গেছে।

লালন এবারে কাতর অনুনয়ের সুরে বলে, মা—আমি তোমার সন্তান হয়ে বেঁচে থাকতে চাই !

তবুও পদ্মাবতীর পাথর তনুতে প্রাণের সাড়া জাগে না।

এবারে লালন মায়ের দুটি হাত ধরে বলে, মা—চলো, আমরা কোথাও চলে যাই। যেখানে তোমাকে নিয়ে আমি আর দয়া নতুন স্বর্গ তৈরি করবো।

পদ্মাবতীর দু'চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়ে। শুধু একবার পলকের জন্যে লালনের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করেন।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত।

পদ্মাবতী হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ সমাজপতির কণ্ঠস্বর শুনে, ছুটে যান বাইরে, সমাজপতির পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েন। আকুল কান্নার মধ্যেও কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে ফোটে, আপনি বলে দিন—আমি এখন কি করবো?

সমাজপতি অনুচ্চ অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, শাস্ত্রের বিধান বড় কঠিন।

পদ্মাবতী ফিরে তাকান সমাজপতির মুখের দিকে। বলেন, আপনি বলে দিন, লালন যদি কোনো পাপ করে থাকে, কিসে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে?

সমবেত নর-নারী সবাই ফিরে চায় সমাজপতির মুখের দিকে। সমাজপতি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন, এর প্রায়শ্চিত্তও নেই। লালন আচার ভ্রষ্ট, ধর্মভ্রষ্ট। তার ছায়া স্পর্শ করাও পাপ।

নানা কণ্ঠে আবার চাপা গুঞ্জন ওঠে।

—তবে? পদ্মাবতীর কণ্ঠে আর্ত জিজ্ঞাসা, তবে কি হবে লালনের?

—সূর্য ওঠার আগেই যেন সে গ্রাম ত্যাগ করে।

সমাজপতির নির্দেশ লালনেরও কানে যায়। সে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে। ছুটে বেরিয়ে আসে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে পদ্মাবতীকে। বলতে থাকে, মা—কিসের পাপ, কিসের প্রায়শ্চিত্ত? তোমার লালন কোনো পাপ, কোনো অন্যায় করেনি। আমি কোনো ধর্ম মানি না। কিসের ধর্ম! কাদের ধর্ম! মা—আমার ধর্ম তুমি, তুমিই আমার ঈশ্বরী।

পদ্মাবতীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে তপ্ত অশ্রুধারা। গভীর আবেগে লালনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কিছু বলতে চান। কিন্তু একটি কথাও ভাষা হয়ে ফোটে না।

এবারে লালন মানসিক উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ওঠে। চিৎকার করে ওঠে সমাজপতির মুখের দিকে চেয়ে, মিথ্যে আপনাদের সমাজ, মিথ্যে

আপনাদের ধর্ম। দাঁড়িয়ে আছেন কেন আপনারা—আমার ছায়া স্পর্শ করা যদি পাপ হয়, তবে কেন এখানে রয়েছেন ? যান—চলে যান এখান থেকে।

রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে ওঠে লালন। যারা ভিড় করে ছিল, এক এক করে তারা চলে যায়। সমাজপতিও ভিড়ের সঙ্গে চলে গেলেন। দেখতে দেখতে লালনের বাড়ির উঠোন শূন্য হয়ে গেল।

শূন্য উঠোনে কিছু সময় লালন দাঁড়িয়ে রইলো একা। তারপর এসে বসলো ঘরের দাওয়ায়। এই মুহূর্তে তার দেহে মনে নেমেছে গভীর অবসাদ।

রাত শেষ হয়ে আসছে।

আকাশের পশ্চিম প্রান্তে টুকরো মেঘের আড়ালে ঢাকা ক্লান্ত চাঁদের মুখ।

লালন বসেছিল ঘরের দাওয়ায়। এবারে উঠোনে নেমে এলো। ফিরে তাকালো পুব-আকাশের দিকে।

রাত শেষ হতে আর দেরি নেই। লালনের মনে পড়ে সমাজপতির কথা। দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই তাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে।

আবার ঘরের দাওয়ায় এলো লালন। দাঁড়ালো ঘরের জানলার ধারে। দেখলো, ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে আছেন মা। হয়তো কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছেন। পাছে মায়ের ঘুম ভেঙে যায়, তাই জানলার কাছ থেকে সরে এলো লালন।

দয়া কি করছে ? হয়তো কেঁদে-কেঁদে সে-ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়ে। কামরার দরজা খুলে দয়াবতী তার কাছেই আসছে।

দয়াবতীকে দেখে বিস্মিত হলো লালন। মনে হয়, অপরিচিতা কেউ।

দয়াবতীর পরনে নব বধূর বেশ। বিয়ের পর ফুলশয্যার রাতে সে এমনি সাজে সেজেছিল।

কুন্ঠিত পদক্ষেপে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ায় দয়াবতী।

—দয়া !

—কেন, চিনতে পারছো না !

লালন অনুচ্চকণ্ঠে বলে, চিনতে না পারার কথা নয় দয়া। কিন্তু এমন সাজে সাজলে কেন ?

দয়াবতীর হাতে ছিল সিঁদুরের কৌটো। কৌটোটা স্বামীর হাতে তুলে দেয়। বলে, তুমি যে বলেছিলে আমার সিঁথি রাঙিয়ে দেবে।

লালন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দয়াবতীর মুখের দিকে।

—কই? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? দয়াবতীর মুখে সেই একই কথা, তুমি যে বলেছিলে আমার সিঁথি রাঙিয়ে দেবে?

এবারে লালন নিজের হাতে রাঙিয়ে দেয় দয়াবতীর সিঁথি।

আশ্চর্য। এই মুহূর্তে দয়াবতীর চোখে বিন্দুমাত্র জল ঝরলো না। অবাক চোখে চেয়ে রইলো স্বামীর মুখের দিকে।

—এবারে বিদায় দাও দয়া।

বলে লালন দু'হাতে স্পর্শ করে দয়ার চিবুক।

—ও কথা বোলো না।

—কিন্তু ওই চাঁদ ডুবে যাবার আগেই যে আমাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে।

—ওগো—কোথায় যাবে তুমি! কেন যাবে?

—দয়া! লালন ফিরে চায় অস্তগামী চাঁদের দিকে। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে। দয়াবতীর চোখে চোখ রেখে বলে, মাকে তুমি দেখো। তুমি থাকবে মায়ের কাছে, এই আমার সান্ত্বনা।

এত সময় স্থির দাঁড়িয়ে ছিল দয়াবতী, এবারে কেমন যেন উতলা হয়ে ওঠে। আকুল জিজ্ঞাসা ফোটে মুখে, সত্যি তুমি চলে যাবে?

লালন অনুচ্চকণ্ঠে বলে, তোমার আঁচল তো আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে না দয়া।

দয়াবতীর দু'চোখ দেখতে দেখতে জলে ভরে ওঠে। কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারে না, শুধু তার ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে। অনুচ্চারিত যত কথা তার সজল চোখের চাউনিতে।

—বিয়ের পর থেকে তোমাকে কোনদিনই সুখী করতে পারিনি দয়া লালনের কণ্ঠস্বরও ভাঙা-ভাঙা শোনায়, এতোদিন যে কথা মনে হয়নি আজ সেই কথাটাই আমার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে। দয়া, তোমাকে আমি কোনদিন কিছু দিতে পারিনি।

—ও কথা কেন? দয়াবতীর কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে কান্নার আবেগে সত্যি বলছি তোমাকে নিয়ে আমার কোনো দুঃখ ছিল না। আজও নেই।

লালন আবার ফিরে চায় অস্তগামী চাঁদের দিকে। বলে, দয়া, আর তো সময় নেই। এবারে আমি যাই। মা উঠে পড়লে হয়তো কান্নাকাটি শুরু করবেন।

দয়াবতী ক্ষণকাল নীরব থেকে কি যেন ভাবে। গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে স্বামীর মুখের দিকে ফিরে চায়।

—দয়া। লালনের কণ্ঠস্বরও ব্যথায় সিক্ত। বলে, কি দেখছো অমন করে?

দয়াবতী কথা বলে না। গলায় আঁচল দিয়ে স্বামীর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে।

লালন দুহাতে তুলে ধরে দয়াবতীকে। দয়াবতীর কণ্ঠে কাতর জিজ্ঞাসা, সত্যি তুমি চলে যাবে!

—বলেছি তো, তোমার ওই সোনালি জরির আঁচল আমাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।

এর পর কয়েকটি নীরব মুহূর্ত কাটে।

এবারে দয়ার মুখে চুম্বন-স্পর্শ দিয়ে লালন বলে, আমাকে যে চলে যেতে হবে দয়া।

দয়াবতী স্বামীর বুকে মাথা রাখে। বলে, কথা দাও—আবার আসবে।

—আসবো বৈ কি। আবার আসবো। দয়া, যাবার আগে তোমার হাসিমুখ দেখতে ইচ্ছে করছে। একটু হাসবে না। হাসলে তোমাকে যতো সুন্দর দেখায়।

হাসি-কান্না এক সঙ্গে ফুটে উঠলো দয়াবতীর মুখে।

লালন ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দয়াবতীর মুখের দিকে চেয়ে।

এই মুহূর্তে শেষ-রাতের ঘুম-ভাঙা পাখি ডেকে উঠলো।

সচকিত হলো লালন। গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ধীর পদক্ষেপে চলতে আরম্ভ করলো।

দয়াবতী শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অস্তগামী চাঁদের দিকে।

চোখের সামনে চাঁদ ডুবে গেল।

ক্ষণকাল জড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে দয়াবতী। তারপর হঠাৎ জড়-চেতনায় যেন প্রাণ ফিরে আসে। ছুটে যায় ঘরে।

পদ্মাবতী তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দয়াবতী লুটিয়ে পড়ে পদ্মাবতীর পায়ের ওপর। ভেঙে পড়ে আকুল কান্নায়।

ঘুম ভেঙে যায় পদ্মাবতীর। ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন, বৌমা! কী হয়েছে, কাঁদছো কেন?

—মা, সে চলে গেছে।

—চলে গেছে! পদ্মাবতী জড়ের মতো বসে রইলেন। এই মুহূর্তে চিন্তা করার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে গেছে।

—মা!

—বৌমা, যাবার আগে সে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না? এতো অভিমান তার?

পদ্মাবতীর দু'চোখ জলে ভরে যায়। পাথর-মূর্তির মতো বসে থাকেন। কান্নার শক্তিটুকুও যেন নেই।

দয়াবতী এবারে উঠে বসে। আঁচলে চোখের জল মুছে পদ্মাবতীর মুখের দিকে চায়।

পদ্মাবতী তখনো বসে আছেন অচঞ্চল। শুধু তাঁর দু'চোখের জল গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়ছে মাটিতে।

রহিমার চোখেও দিন রাত জল ঝরে। কাজের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে রাখতে চায় সে, ভুলে যেতে চায় লালনের কথা, তবু তো ভুলতে পারে না। লালন যে তার মনের অনেকখানি জায়গা দখল করে নিয়েছে।

সেদিন অপরাহ্ণ।

রহিমা ন্যাতা-গোবর দিয়ে ঘরের দাওয়া নিকোচ্ছিল। কিন্তু ন্যাতা-গোবর রইলো হাতে, দাওয়া নিকোনোর কথা ভুলে গেল।

কাজের কথা ভুলে রহিমা চুপচাপ বসে আছে দাওয়ার কোণে। বসে লালনের কথাই ভাবছে।

স্বামী মোকসেদ তাঁতশালার কাজ সেরে ঘরে আসছে। উঠোনে পা দিয়েই উন্মনা রহিমাকে দেখতে পায়। জিজ্ঞাসা করে, কি ভাবছো অমন করে?

রহিমা আড়চোখে স্বামীর মুখের দিকে একনজরে তাকিয়ে হাতের কাজে মন দেয়।

মোকসেদ আপন মনে হাসতে হাসতে উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠে রহিমাকে শুনিয়ে বলে, সোনার দাঁড়ে বসালেও বনের চিড়িয়া পোষ মানে না রহিমা।

রহিমা বলে, দেখো, সে ঠিক আসবে। আমার মন বলছে সে না এসে পারে না।

মোকসেদ বলে, সে আশা ছেড়ে দাও।

রহিমা বলে, আমার কথা না হয় মিথ্যে হলো, কিন্তু সাঁইবাবার কথা তো মিথ্যে হয় না। সাঁইবাবা বলেছে সে ঠিক আসবে, আমারে মা বলে ডাকবে।

মোকসেদ বলে, যেমন তুমি, তেমন তোমার সাঁইবাবা। সাঁইবাবা তো একটা বদ্ধ পাগল।

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল মোকসেদ, চুপ করে যায় শিঙার আওয়াজ শুনে।

আমবাগানের ভিতরের পথ দিয়ে সিরাজ সাঁই শিঙা বাজাতে বাজাতে এদিকেই আসছে।

—কইরে, তোর বেটা এলো ? উঠোনে পা দিয়েই সিরাজ জিজ্ঞাসা করে।

—সাঁইবাবা !

রহিমা ফিরে চায় সাঁইবাবার মুখের দিকে।

—ভাবিস নে মিছে। সিরাজ বলে, আসবে—সে বেটা নিশ্চয়ই আসবে। আমার মন বলছে, সে না এসে পারে না। মনের কথা কি মিথ্যে হয় রে ? মনের মধ্যে যে সেই রসুলের বাস।

রহিমা যেন স্বস্তি পায় সাঁইবাবার কথায়। তার যে স্থির বিশ্বাস সাঁইবাবার কথা মিথ্যে হবার নয়।

—মা, মা, মা !

দূর থেকে ভেসে আসে উচ্চকণ্ঠের ডাক। কণ্ঠস্বর পরিচিত। লালনের কণ্ঠ ভুল হবার নয়।

সিরাজ সাঁই-এর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আর রহিমা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সাঁইবাবার মুখের দিকে।

লালনের কণ্ঠস্বর ততক্ষণে আরো কাছে এগিয়ে এসেছে।

রহিমা আর স্থির থাকতে পারে না। ছুটে যায় সামনের পথের দিকে।

লালন আসছে সামনের পথ ধরে। একরকম ছুটেই আসছে সে। রহিমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর যেন উচ্চগ্রামে পৌঁছয়।

—মা, মা,—ছুটে এসে লালন জড়িয়ে ধরে রহিমাকে। পাগল শিশুর মত বলতে থাকে বারবার,—মা, আমি এসেছি মা। তোমাকে ছেড়ে আর আমি কোথাও যাবো না।

রহিমার মুখে কথা নেই। অফুরন্ত আনন্দে উদ্বেলিত সে, কোথায় এই আনন্দ-ঘন মুহূর্তে হাসবে, তা নয়—তার দু'চোখে তখন জল টলমল করছে।

সিরাজ সাঁই-এর মুখে এক বিচিত্র হাসি। এই মিলন দৃশ্য দেখে একতারা তুলে নেয় হাতে। আনন্দে নেচে নেচে গান গাইতে আরম্ভ করে।

গান শেষ হয়। গান বলতে একটি কলিই বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাওয়া।

এক বিচিত্র ভাবের উদয় হয়েছে সিরাজের মনে। পাগলের মতো চিৎকার করে বলতে থাকে, ওরে কে আছিস, তোরা দেখে যা। আমার কৃষ্ণ-কালা মা যশোদার কাছে ফিরে এসেছে। মা যশোদা যত কাঁদে আমার কৃষ্ণ তত কাঁদে। ওদের চোখে যত জল, যমুনার বুকে তত জল নেই রে। কোথায় আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচবে, তা নয় কাঁদছে। রসুলের কি আজব কারবার।

বলতে বলতে সিরাজের দু'চোখেও জল ঝরে। সজল চোখে চেয়ে থাকে রহিমা আর লালনের দিকে।

সাঁইজীর হাতের একতারা তখনো বেজে চলেছে।

নদী তীর। অপরাহ্ন।

ছোট্ট একটি বাবলা গাছ। চিকনছায়া পুবে ছড়িয়ে পড়েছে।

গাছের নিচে একা বসে আছে লালন। দৃষ্টি তার নদীপারের সবুজ গাছপালার দিকে।

নির্জনে বসে কি যেন ভাবছে সে। হয়তো আপন মনের কথা। হয়তো আপন ব্যথা-বেদনার কথা।

ভাবনার মধ্যে শূন্যতা জড়ানো। শূন্য মন। আকাশের মত।

আকাশে ডানা মেলেছে নীড়-সন্ধানী পাখিরা। মনের আকাশেও তেমনি নানা স্মৃতির আনাগোনা।

হঠাৎ চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়। সুরের গুঞ্জন শুনে ফিরে তাকায়।

সাঁইজী এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

—সাঁইজী!

লালন ফিরে তাকায় সাঁইজীর মুখের দিকে। সাঁইজীর মুখ হাসির আলোয় উদ্ভাসিত।

—কি রে, কি ভাবছিস একলা বসে? সিরাজ সাঁই নিবিড় হয়ে বসে লালনের মুখোমুখি।

—কিছু না। লালন বলে, কি আর ভাববো?

—আমিও তাই ভাবছি, সিরাজ মৃদু শব্দ করে হাসে, তোর আবার ভাবনা কি?

সিরাজ একতারার তারে সুরের ঝংকার তোলে।

কিছুক্ষণের জন্যে দু'জনেই চুপচাপ বসে থাকে। তারপর লালনের নতুন এক জিজ্ঞাসা শুনতে পায় সিরাজ, সাঁইজী, বলতে পারো মনের জ্বালা জুড়োয় কিসে?

সিরাজের মুখে বিচিত্র হাসির রেখা ফুটে ওঠে। বলে, হ্যাঁরে তোর মন আছে নাকি রে?

লালন অবাক হয় সাঁইজীর কথায়। মন থাকে না এমন মানুষ আছে নাকি সংসারে!

বিস্ময় জড়ানো দৃষ্টিতে লালন ফিরে চায় সাঁইজীর মুখের দিকে।

—অমন করে দেখছিস কি? সিরাজ বলে, বললি না তো তোর মন আছে কিনা?

—আছে বৈকি।

—কই, দেখি কেমন তোর মন।

—মন যে চোখে দেখা যায় না সাঁইজী।

—তবে তার আবার জ্বালা কি? যা চোখে দেখা যায় না, তা নিয়ে কিসের জ্বালা?

লালনের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয় সিরাজের কথা। কথা না বলে সাঁইজীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে নতুন কিছু শোনার প্রত্যাশায়।

—আরশিতে মুখ দেখেছিস? সিরাজ বলে, পরকলার মধ্যে মুখ ভাসে। কিন্তু মন ধরা পড়ে মনের আরশিতে।

—সে মন কোথায় পাবো?

—খুঁজে ছাখ, খুঁজলে পরে পাবি। বলে সিরাজ উঠে দাঁড়ায়।

—সাঁইজী!

সিরাজ ততক্ষণে চলতে আরম্ভ করেছে। যেতে যেতে আবার বলে যায়, খুঁজে ছাখ—খুঁজলে পরে পাবি।

—সাঁইজী। বলে লালনও উঠে দাঁড়ায়।

সিরাজ একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়ায়। একতারায় ঝংকার তুলে গানের সুরে বলে ওঠে,

সে মন কোথায় পাবো?
বলতে পারো—
মনের ঠিকানা?
গুরু বলে,
খুঁজে ছাখ—
খুঁজলে পরে পাবি রে মন
মনের নিশানা।

আর দাঁড়ায় না সিরাজ। একতারা উর্ধ্বে তুলে হনহন করে এগিয়ে যায় নদী তীরের পথ ধরে।

লালন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সাঁইজীর চলার পথের দিকে।

সাঁইজী চোখের আড়ালে চলে যেতে লালন গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আবার বাবলা গাছের নিচে বসে। সাঁইজীর গানের কথাগুলো তখনো তার মনের মধ্যে।

যেটুকু বেলা ছিল ফুরিয়ে এলো দেখতে দেখতে। দিনান্তের সূর্য তখন নদীপারে সবুজ গাছপালার আড়ালে।

লালন তখনো চুপচাপ বসে আছে। দৃষ্টি তার উদাস। মুহূর্তে মনটাও যেন শূন্য হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। দূরের পাখিরা ফিরে আসছে নীড়ে। রাখাল বালকেরা মেঠো পথ ধরে গরু মহিষের বাথান নিয়ে চলেছে ঘরে।

নদীর বুকে ভেসে চলেছে পালতোলা ডিঙি। দূর গ্রামের পথিক নদীপারের পথ দিয়ে ফিরে চলেছে আপন ঠিকানায়।

লালন এক সময় আত্মগত সুরে বলে, সে মন কোথায় পাবো?

সাঁইজীর কথা কানের কাছে বাজে। খুঁজে ছাখ—খুঁজলে পরে পাবি।

আচমকা লালনের চমক ভাঙে। ফিরে তাকায় ভরা নদীর দিকে। সামনেই কিনারায় বসে মাটির কলসিতে জল ভরছে অচেনা অদেখা তরুণী কন্যা। কলসিতে জল ভরার শব্দটা কানে আসতেই ওর চমক ভেঙেছে।

তরুণী কন্যা বোধ হয় দেখতে পায়নি লালনকে। নয়তো সে শিথিল আঁচল গুছিয়ে নেয়নি কেন!

তরুণীর দিকে তাকিয়ে রইলো লালন। সুন্দরী তরুণী। আপন মনে জল ভরছে। হয়তো জল ভরতে গিয়ে কিছু ভাবছে সে। নয়তো ভরা কলসি ডুবিয়ে অমন করে হেঁট মাথায় বসে থাকবে কেন?

লালনের দৃষ্টি তখনো তরুণীর ঢলঢলে মুখের দিকে। ভরা কলসি কাঁখে তুললো তরুণী। পা বাড়াতেই তার চোখ পড়লো লালনের ওপর। পলকের দেখা। চার চোখের পলকের মিলন? তরুণী লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলো। তাড়াতাড়ি চলতে, চলকে পড়লো ভরা কলসীর জল। শাড়ির শিথিল আঁচল বুকের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে চলতে সুরু করলো তরুণী। দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল সে।

লালনের মনে অনাস্বাদিত রোমাঞ্চের স্বাদ। সেই সঙ্গে একটা সুরের অনুরণন:

ক্ষণকাল উন্মনা লালন চুপচাপ বসে রইলো। শূন্যতার মধ্যেও যেন পূর্ণতা।

লালন নিজেই জানে না, কখন আপনা হতে তার কণ্ঠে সুর জাগলো। শুধু সুর নয়—একটি গানের ভাষা জন্ম নিলো তার কণ্ঠে।

'আমার পাড়ার কাছে আরশিনগর,
পড়শী বসত করে—'

আপন সুরে আপনি তন্ময় হলো লালন। এই মুহূর্তে মনে মনে অনুভব করলো নতুন জন্মের স্বাদ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আকাশে দেখা দিয়েছে শুক্লপক্ষের চাঁদ। সে চাঁদের আলো ঝরে পড়েছে মাটির পৃথিবীতে।

এখনো ঘরে ফেরার কথা একটিবার মনে আসেনি লালনের। চুপচাপ সম্মোহিতের মতো বসে আছে নদীর তীরে মাটির ঢিবির ওপর। দৃষ্টি তার আকাশের চাঁদের দিকে।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে কেমন যেন অবসাদ জড়িয়ে এলো লালনের দেহ-মনে।

আকাশের প্রান্তে ছিল চাঁদ। সে চাঁদ দেখতে দেখতে কত ওপরে উঠে এলো।

জোয়ারের জলে পূর্ণ হলো নদী। মৃদু ঢেউ আছড়ে পড়লো তীরে। লালনের পায়ে লাগলো জলের ছোঁয়া।

চেতনার বিন্দুতে ফিরে এলো লালন। উঠে দাঁড়ালো। গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। তারপর শূন্য মনে ফিরে চললো আপন আশ্রয়ে। যেখানে রহিমা অপেক্ষা করে আছে তার পথ চেয়ে।

কতোদিন হলো ঘর ছেড়েছে লালন। সেই থেকে দয়াবতী যেন কেমন হয়ে গেছে। অমন যে সুন্দরী ছিল, আজ তাকে চেনাই যায় না। শীর্ণ দেহ, চোখের কোণে কালি ঢালা, তারপর বিবর্ণ-নিষ্প্রভ মুখ। মাথার অমন সুন্দর চুল রুক্ষ অবিন্যস্ত। কতোদিন ও চুলে তেল পড়েনি, চিরুনি দেয়নি। কি হবে দেহটার পরিচর্যা করে। দেহের পরিচর্যার কথা ভুল করেও মনে হয় না। দিনে রাতে তার একই চিন্তা—কি হবে বেঁচে থেকে।

শুধু কি দয়াবতী!

পদ্মাবতীরও সেই একই অবস্থা। চিন্তাটা যেন তাঁর আরো বেশী। যে ক'দিন জীবন আছে সে ক'দিন তো জীবনের ছোট ছোট দাবিগুলো মেটাতে হবে। ক্ষিধে-তেষ্টা আছে, রয়েছে লজ্জা নিবারণের দাবিটুকু। সে সব পূর্ণ হয় না—তবু তো পূর্ণ করার চেষ্টা।

সংসারে তো কিছুই নেই। যেটুকু চাষের জমি ছিল, বিকিয়ে গেছে দেনার দায়ে। আশ্রয় সামান্য দো-চালায়। কোনদিন তা-ও ভেঙে পড়বে। থালা, ঘটি, বাটি– ঘর-সংসারে টুকিটাকি যা ছিল, এক এক করে সব গেছে। সম্বল কিছুই নেই। এখন ভরসা, দরজায় দরজায় ঘুরে আঁচল পেতে ভিক্ষে করা।

সেদিন দুপুর।

দয়া বসে আছে ঘরের দাওয়ায়। দৃষ্টি তার সামনের পথের দিকে। পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, হাতে একগাছি করে শাঁখা—নয়তো আর কোনো অলংকার নেই অঙ্গে। বসে আছে মায়ের অপেক্ষায়।

কোন্ সকালে বেরিয়েছেন মা—এত বেলা হলো, এখনো ফিরলেন না, এই জন্যেই মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা।

—বৌমা!

পদ্মাবতীর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই দয়াবতীর চমক ভাঙে। সামনের পথ দিয়ে না এসে খিড়কির পথে এসেছেন মা।

—মা!

পদ্মাবতীর আঁচলে বাঁধা চাল আর কিছু কাঁচা তরকারি। সেগুলো দাওয়ার মাটিতে ঢেলে দিয়ে পদ্মাবতী বলেন, এ ক'টা ফুটিয়ে নাও বৌমা।

—মা!

—ভিক্ষে করে নিয়ে এলাম। পোড়া পেটতো শুনবে না। পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা।

দয়াবতী কি বলবে ভেবে পায় না। চাল তরকারির দিকে তাকিয়ে ভাবে, কপালে এ-ও ছিল।

—তুমি হেঁসেলে যাও বৌমা, আমি ততক্ষণে একটা ডুব দিয়ে আসি। রোদে-রোদে ঘুরে গা-মাথা যেন জ্বলছে।

ছেঁড়া গামছাটা নিয়ে পদ্মাবতী পুকুরের দিকে গেলেন। ভিক্ষের চাল-তরকারিগুলো নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো দয়াবতী।

রাঁধতে বসেছে দয়া। কাঁদবে না রাঁধবে। বারবার আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। কিন্তু চোখের ভিজে পাতা শুকোয় না।

এদিকে স্নান সেরে পদ্মাবতী রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। দয়াবতীকে চোখের জল মুছতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, কি হলো বৌমা?

—কিছু না মা। দয়াবতী চোখের জল গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে, বড্ড ধোঁয়া।

দয়াবতীর কথায় পদ্মাবতীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে হাসি কান্নার চেয়ে করুণ।

লালন খেতে বসেছে। পাশে বসে রহিমা। প্রতিদিন দুপুরে, রাত্রে লালনকে বসে থেকে খাওয়ায় রহিমা।

অন্যদিন খাবার সময় কত কথা বলে লালন। আজ প্রথম থেকেই সে চুপচাপ। তেমন খেতেও পারছে না। ভাত, তরকারি হাত দিয়ে নাড়ছে শুধু।

রহিমা বুঝতে পারে না কি হয়েছে লালনের।

এই মুহূর্তে লালনের মনে পড়ছে গৌরী নদীর পারে পল্লীর পরিবেশে সেই জীর্ণ কুটিরের কথা। সেখানে মায়ের সঙ্গে কত দুঃখে দিন কাটাচ্ছে দয়াবতী। হয়তো খাবার জুটছে না তাদের।

লালন আর খেতে পারে না। উঠে পড়ে।

রহিমা জিজ্ঞাসা করে, কি হলো?

—কিছু না।

—কিন্তু ভাত ফেলে উঠলি কেন লালন?

—আমি আর খাবো না মা। বলে লালন ঘরের বাইরে চলে যায়।

রহিমা স্থির থাকতে পারে না। সেও বাইরে আসে। লালনকে ডেকে বলে, লক্ষ্মী ছেলে, ভাত ফেলে উঠতে নেই।

—মা! লালন ফিরে দাঁড়ায়। বলে, আজ আমাকে কিছু বোলো না

—কিন্তু কি হয়েছে?

—সে তুমি বুঝবে না মা। বলে লালন দাওয়া থেকে উঠোনে নামে।

—কিন্তু যাচ্ছিস কোথায় ?

—সাঁইজীর আখড়ায়।

বলে আর দাঁড়ায় না লালন। একবার পিছন ফিরেও তাকায় না। আম কাঁঠালের বাগানের ভিতরকার পথ ধরে হনহন করে চলে যায়। রহিমা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে লালনের দিকে। দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে হারিয়ে যায় লালন।

রহিমা তবুও দাঁড়িয়ে থাকে। কখন যেন তার দুচোখে জলে ভরে উঠেছে।

নদীর কিনারায় বৃদ্ধ বটের ছায়ায় ফকির সিরাজ সাঁই-এর আখড়া। আখড়ায় ঘর বলতে কিছু নেই; বটের ঝুরির মধ্যে তালপাতা দিয়ে বানানো ছোট একটা খুপরি।

শুধু বাঁশের বাখারি দিয়ে বানানো একটি মাত্র দরজা। ওইটিই যাওয়া-আসার পথ। নয়তো চারদিক বাঁশের ছ্যাঁচা আর লতাপাতা দিয়ে ঘেরা।

সিরাজ সাঁই আখড়ায় নেই। শূন্য আখড়া। একটা নেড়ি কুকুর কুটুরির দরজার কাছে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে।

লালন চারদিকে ফিরে তাকায়। কেউ কোথাও নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষটা এসে বসলো একান্তে একটি বেদীর ওপর। মাটির বেদী। নিকোনো, ঝকঝকে। একটা শিউলি গাছ পাশেই।

লালন জানতো না, এই বেদীর ওপরে বসেই সাঁইজী সাধন ভজন করে।

বেদীর ওপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসলো লালন। বসে থাকতে কেমন যেন এক অনুভূতি জাগলো মনের মধ্যে। একটু রোমাঞ্চ একটু শিহরণ, সেই সঙ্গে বিচিত্র রসানুভূতি।

আরো সময় যায়। লালনের দুচোখ বন্ধ হয়ে যায় এক বিচিত্র আবেশে। বাইরে এতো আলো—সূর্য জ্বলছে। তবু লালনের মনে হয়, বাইরের আলো যেন নিবে যাচ্ছে। কিন্তু মনের ভিতরে নানা রঙের আলোর রোশনাই।

লালন জানে না, কতো সময় সে মনের গভীরে ডুব দিয়ে বসে আছে।

ও ভুলে গেছে সময়ের হিসেব, ভুলে গেছে বাইরের খবর। ওর বর্হিচেতনা বিলীন হয়ে গেছে অন্তর্চেতনায়।

হঠাৎ চমক ভাঙে লালনের। সেই সঙ্গে জাগে অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ। চোখ মেলে তাকাতেই দেখতে পায় সিরাজ সাঁই ও আর একজন সৌম্য পুরুষ দাঁড়িয়ে।

লালন যেন সবে ঘুম থেকে উঠেছে। একটা স্বপ্নের রাজ্য থেকে যেন এইমাত্র ফিরে এসেছে।

সাঁইজীর মুখে মৃদু হাসি, মুখে কোনো কথা নেই।

লালন ভাবাবেগের সুরে বলে, আমার কি হবে সাঁইজী?

সিরাজ বলে, যা হবার তাই হবে। তুই কি করে বেটা—আমার খাশ মহলে এতো জায়গা থাকতে ঠিক এই বেদীটার ওপর বসলি! বসে আবার জিজ্ঞেস করছিস আমার কি হবে?

এবারে লালন ফিরে তাকায় অপরিচিত পুরুষের দিকে। সৌম্য দর্শন পুরুষের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। অপরিচিত মানুষটির চোখটা যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তারপরেই মানুষটির মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেন দু'জন, দুজনেরই চেনা-জানা।

সিরাজ বলে লালনকে উদ্দেশ্য করে, হাঁ করে দেখছিস কি?

লালন মাথা নিচু করে।

সিরাজ বলে, আমার সখা—কাঙাল হরিনাথ। ভেক নিয়েছে কাঙালের। আসলে ও রাজার রাজা। নে—কাঙালের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নে।

লালন প্রণাম করে কাঙাল হরিনাথকে। হরিনাথ আশীর্বাদ জানিয়ে বলেন, আজ যেমন তোমাকে ভাবের ঘোরে দেখলাম, এই ভাব নিয়েই যেন তোমার জীবন ভোর হয়।

সিরাজ বলে, ভাব বলো, আর অভাব বলো—ওর কাছে দুই-ই সমান। বেটার জাত-মান সব গেছে, এখন আছে ফকিরী নেবার ফিকিরে। বেটা আমার শাহেন শা।

কাঙালের মুখে হাসির আভাস। বলে, ওকে আমি দেখেই চিনেছি সাঁইজী। ও তোমার পাকা সোনা। ওকে আমি ছোট সাঁই বলে ডাকবো সাঁইজী।—কি গো ছোট সাঁই, নাম রাখতে পারবে তো সাঁইজীর?

লালন অবাক হয়েছিল এই বিচিত্রভাবের মানুষটিকে দেখে। আরো অবাক হয় মানুষটির কথা শুনে।

কাঙাল বলেন, অমন চাতক পাখির মতো দেখছিস কি! আমি কি বর্ষার মেঘ, যে আমার দিকে চেয়ে থাকলে তেষ্টা মিটবে?

লালন এবারে মাথা নিচু করে।

কাঙাল এবারে লালনের পিঠে মৃদু কারাঘাত করে বলেন, হ্যাঁ রে গান জানিস? শোনা—একটা গান শোনা। প্রাণটা ঠাণ্ডা করে নিই। কি, গান-টান আসে তো?

সিরাজ বলে, বেটা আমার তাতে ভালো। বাঁশীও বাজায়, গানও গায়।

লালন অসহায় ভঙ্গিতে ফিরে তাকায় সিরাজের মুখের দিকে। সাঁইজী একি বিপদে ফেললো তাকে।

—সাঁইজী!

—আমি জানি রে লালন, তোর প্রাণের মধ্যে অফুরন্ত সুর। বলে সাঁইজী নিজের হাতের একতারাটা লালনের হাতে তুলে দেয়।

লালন কি করবে ভেবে পায় না। একতারা হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

—কি হলো! সিরাজ বলে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বাজা—একতারা বাজা।

লালনের হাতের একতারা ঝংকৃত হয়ে ওঠে। কণ্ঠে জাগে সুর।

আজ আমার অন্তরে কি হলো সাঁই—লালনের কণ্ঠে ভাষা পায় গান। য গানের সুরে ডুব দেয় লালন। নিজেই বিভোর হয় স্ব-ভাবে। তার চোখ দিয়ে দরদর ধারায় গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা।

সিরাজ সাঁই-এর দু'চোখের কোণেও জল জমে ওঠে। সে জল বিন্দু য়ে ঝরে পড়ে মাটিতে।

কাঙাল হরিনাথের চোখেও জল। ভাবাবেশে বিভোর হয়ে জড়িয়ে রেন লালনকে। বলেন, তোর গানে এতো সুর, এতো ভাব—এ গান তুই কাথায় শিখলি রে?

লালন অনুচ্চকণ্ঠে বলে, জানি না।

কাঙাল আত্মগত সুরে বলেন, এত সুর, এত ভাব—আমার মনটা রে গেল রে।

সিরাজের মুখে সেই একই কথা, তুই অবাক করলি আমাকে। কে তোকে এমন করে গাইতে শেখালো!

লালন বলে, গান আমি গাইনি সাঁইজী। যে গেয়েছে সে আর একটা মানুষ, সে যে কোথায় আছে জানি না!

সিরাজ আবেগ-সিঞ্চিত কণ্ঠে বলে, ফকির বাউল তো সেই মানুষেরে খুঁজে বেড়ায়। সে যে বাউলের বাউল। তারে যখন পুরোপুরি আপন করে পাবি তখন তো তোর সব পাওয়া হয়ে গেল।

লালনের কণ্ঠে কাতর জিজ্ঞাসা, তারে কি পাওয়া যায় সাঁইজী?

সিরাজ বলে, যায় বৈকি। সে তো মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। ধরতে চাইলে ধরা যায় না। ডাকার মতো ডাকলে কাছে আসে।

লালনের মনে আরো জিজ্ঞাসা। কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বলতে পারে না।

সিরাজ আবার বলে, ওরে মনটারে ভালোবাসার রসে ডুবিয়ে নে। তারপর তারে প্রাণ ভরে ডাক। ডাকার মতো ডাকলে পরে সে মানুষ কাছে আসে।

দিনকয়েক পরের কথা।

অপরাহ্ণে নদীর তীরে এসে বসেছে লালন। চুপচাপ বসে আছে। চিন্তা শূন্য, ভার শূন্য তার মন।

মনে এলো, সাঁইজীর সেদিনের কথা। 'ওরে মনটারে ভালোবাসার রসে ডুবিয়ে নে। তারপর তারে প্রাণ ভরে ডাক। ডাকার মতো ডাকলে পরে সে মানুষ কাছে আসে'।

কিন্তু কে সে! কোথায় তার ঠিকানা!

অস্ফুট কণ্ঠের আওয়াজে সচকিত লালন ফিরে তাকায়। সেদিনের সেই হঠাৎ-দেখা তরুণীটি জল ভরতে এসেছে নদীতে। পলিমাটির ওপর দিয়ে চলতে পায়ের নিচে কিছু একটা ফুটেছে। তাই অস্ফুট কণ্ঠের ধ্বনি—উঃ।

লালন লক্ষ্য করে, কলসিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে হেঁট হয়ে পা দেখছে তরুণীটি।

ভাঙা শামুকের টুকরো ফুটেছে তরুণীর পায়ে। হাত দিয়ে টেনে বার

করে শামুকের টুকরো। তারপর কলসিটা কাঁখে তুলে নিয়ে জলের কাছে এগিয়ে যায়। কলসি ভরে জল নিয়ে আবার সে নরম পলিমাটির ওপর দিয়ে পাড়ে উঠে আসে।

লালনের দৃষ্টি তরুণীটিকে অনুসরণ করে ফিরে আসে। তরুণী চলে যায় চোখের আড়ালে।

বিলম্বিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে লালন ফিরে চায় নদীর দিকে। মাঝ নদী দিয়ে পাল তোলা ডিঙি চলেছে ভাঁটার টানে।

এই মুহূর্তে লালনের মনের পর্দায় প্রতিবিম্বিত হয় আর একটি করুণ মুখ। সে মুখ দয়াবতীর।

দয়াবতী কি করছে এখন ?

লালন মনে মনে দয়ার নাম উচ্চারণ করে।

দয়াবতী বসে আছে কুটির অঙ্গনে। জীর্ণ কুটির। হৃতশ্রী। আর দয়া!

দয়াবতীর পরনে শতছিন্ন বেশবাস। দেহ দুর্বল। মুখের চেহারা বিবর্ণ। চোখের কোণে কালি ঢালা। দৃষ্টি নিষ্প্রভ। চেনা মানুষও ভুল করবে দয়াবতীকে চিনে নিতে।

দয়ার সেই বিবর্ণ মুখটা লালন তার কল্পনার চোখে দেখতে পায়।

দয়া!

লালন আর্ত-কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে দয়ার নাম ধরে। তারপরেই উঠে দাঁড়ায়। চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলে, আমি যাবো দয়া, তোমার কাছে আমি যাবো। হাসি ফোটাবো তোমার মুখে।

পরমুহূর্তে সব কিছু কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার অনুভূতি ওকে বিবশ করে তোলে।

আর অপেক্ষা করে না লালন। সেই ব্যথাটা বুকের মধ্যে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

রহিমা বসেছিল লালনের অপেক্ষায়। লালনকে আসতে দেখেই উঠোনে নেমে আসে। বলে, কোনো সকালে বেরিয়েছিস, আর এই এলি ?

—মা! লালন বলে, তোমার এই ছন্নছাড়া ছেলেটি যে কোনদিন নিয়ম মেনে চলতে শেখেনি। তুমি একটু মানিয়ে নিও।

রহিমা বলে, পাগল ছেলে, আয় খাবি আয়।

—খেতে ইচ্ছে নেই।

—তোমার ইচ্ছে নিয়ে তুমি থাকো, দাওয়ার ওপর বসেছিল মোকসেদ। বলে ওঠে, কিন্তু তোমার জন্যে যে ও মানুষটা উপোস করে থাকে. সে দিকে হুঁশ আছে।

আর কোনো কথা নয়, লালন নিঃশব্দে রহিমাকে অনুসরণ করে ঘরের ভিতর আসে।

—বস। আমি খাবার আনছি।

লালন তালপাতার চাটাই-এর ওপর বসে মনটাকে শিথিল করে দেয়। ফেলে আসা জীবনের কোনো কথা ভাববে না সে।

রহিমা খাবারের থালা রাখে লালনের সামনে। বলে, আমার দিকটা একটু দেখবি তো।

—মা! লালন বলে, চার দেয়ালের ঘর আমার জন্যে নয় মা।

কথাটা রহিমার মর্মে গিয়ে পৌঁছয়। বিস্ময় মেশানো দৃষ্টিতে ফিরে চায় লালনের মুখের দিকে।

লালন কথা না বলে মাথা নিচু করে।

সেদিন সিরাজ সাঁই-এর আখড়ায় এলো লালন। সাঁইজী বসেছিল আখড়ার ছোট্ট খুপরির সামনে। লালনকে দেখতে পেয়েই সাঁইজী বলে ওঠে, কি রে—আজ যেন একেবারে কোমর বেঁধে এসেছিস। ঝগড়া করবি নাকি?

প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত। লালন কি বলবে ভেবে পায় না। নীরবে এসে দাঁড়ায় সাঁইজীর সামনে।

—কি, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

—সাঁইজী, লালন বলে, এবার থেকে আমি তোমার কাছে থাকবো।

—এখানেও তো ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘর। সে ঘরে আবার দরজা একটা। যে দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে আসা আর যাওয়া। ঘর যখন ছাড়বি তখন এক ঘর ছেড়ে আর এক ঘর কেন? তার চেয়ে পথটাকেই সার কর না। খাঁটি বাউল হবি তো পথে বেরিয়ে পড়। যেদিকে চোখ যায় সেদিকে যা।

—সাঁইজী!

—হ্যাঁ রে, তুই বেরিয়ে পড়। আমার এই ঘর দেখছিস—এ ঘর পথের মধ্যেই পাতা। এটা না ঘর, না খেলাঘর—বুঝলি! ঘরের কথা ভাববি পরে, আগে ঘর ছাড়।

—কিন্তু কোথায় যাবো সাঁইজী?

—বাউলের আসা-যাওয়ার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। যে দিকে খুশি চলে যা। নজর রাখবি সামনের দিকে। পিছন ফিরে চাইবি না। মোহিনীর মায়ায় ভুলবি না। বাউলের জীবন হলো স্রোতের ভেলা। যেদিকে স্রোত সেই দিকে ভেসে চলা। তা সে জোয়ারেই হোক আর ভাঁটাতেই হোক। ভেসে চলাটাই সত্যি, জোয়ার ভাঁটার খবরে দরকার নেই। কিরে, বুঝলি আমার কথা?

—সাঁইজী, যদি পিছু ফিরে আসতে হয়!

—আসতে হয় আসবি। সিরাজ সাঁই উঠে দাঁড়ায়। লালনের দুটি হাত আপন হাতের মুঠোয় এনে বলে, ওরে, কথায় বলে 'লাখো ক্রোশ পথ চলবি, তবে রে মন বাউল হবি'। আমি যে তোর মধ্যে সেই বাউলকে দেখেছি, যে বাউলকে আমি জীবন ভোর খুঁজে বেড়িয়েছি।

—সাঁইজী!

সিরাজের কথায় লালন বিস্ময়ে অভিভূত।

—হ্যাঁ রে, তুই সেই বাউলের বাউল।

—কিন্তু?

—কোনো কিন্তু নেই রে। আমি নিজের হাতে তোকে বাউলের বেশে সাজাবো। একতারা আর খঞ্জনি তুলে দেবো তোর হাতে—বলে সাঁইজী দু'হাতের আলিঙ্গনে বুকের মধ্যে টেনে নেয় লালনকে।

অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ জাগে লালনের দেহে মনে। অবাক চোখে চেয়ে থাকে সাঁইজীর মুখের দিকে।

সাঁইজীর মুখে ফুটে ওঠে প্রশান্ত হাসি। বলে, আয়—তোকে সাজিয়ে দেই। নিজেকে রাধা করে তোকে কৃষ্ণরূপে সাজাই।

লালনকে বাউলের বেশে সাজালো সিরাজ। হাতে তুলে দিল একতারা

আর খঞ্জনি। ললাটে একে দিল মৃত্তিকার টিপ। চূড়ো করে বেঁধে দিল মাথার চুল। তারপর লালনকে এনে বসালো তার সাধন-বেদীতে। বললে, দু'চোখ বন্ধ করে এবারে বাইরের সব আলোগুলো নিবিয়ে দে লালন। বন্ধ করে দে দেহ-কুঠুরির সব দরজা জানালা। এবারে চেয়ে ছাখ অন্তরের খাশমহলের দিকে। দেখেছিস, সেখানে কে বসে আছে!

ভাব সমাহিত লালন। নিজের ভাবে নিজেই বিভোর। সাঁইজীর কথা বোধহয় তার কানে পৌঁছয়নি। কি করে পৌঁছবে! তার দেহ-কুঠুরির সব দরজা জানালা যে বন্ধ হয়ে গেছে।

- সাঁইজী বলে, ওরে মনের আগলটা খুলে দে। চেয়ে ছাখ, মনের মধ্যে বসে আছেন সেই মানুষ।

লালনের অন্তর-বাহির যেন এক হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায়।

সিরাজের মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র এক হাসি। কণ্ঠে জাগে সুরের গুঞ্জন। তারপর আত্মহারার মতো গেয়ে ওঠে,

'ওরে, এই মানুষে সেই মানুষ আছে
ছাখ রে চেয়ে মন,
যার খোঁজে ক্ষ্যাপা বাউল
বেড়ায় ত্রিভুবন।'

অসমাপ্ত থাকে সিরাজের গান। এদিকে অপূর্ব ভাবাবেশে লালন একতারা আর খঞ্জনি বাজিয়ে গাইতে আরম্ভ করে,

'আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে,
আমি জনম ভোর একদিন দেখলাম না রে।'

গানের মধ্যে ডুবে যায় লালন। তার দু'চোখে গড়িয়ে পড়ে ভক্তি-অশ্রু কোনোদিকে ফিরে তাকায় না সে। গান গাইতে গাইতে নাচের ছন্দে এগিয়ে যায় সিরাজ সাঁই-এর আখড়ার সীমা পেরিয়ে।

লালনের সামনে পথ। যে পথ চলে গেছে অনির্দিষ্ট ঠিকানায়। পথের কোনো রেখাচিত্র আঁকা যায় না।

দিন যায়। দিনের পর দিন। মাস পেরিয়ে যায়। ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে একটি বৎসর শেষ হয়ে যায়।

লালনের পথ চলার বিরাম নেই। আজ এখানে, কাল সেখানে। চলতি পথে কতো গ্রাম, কতো জনপদ অতিক্রম করে যায় লালন। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই—রোদ, জল, ঝড় মাথায় নিয়ে পরিব্রাজক বাউল গান গেয়ে পথ চলে। মানুষ অবাক হয়ে শোনে তার গান, অবাক চোখে ছাখে এই বিচিত্র মানুষটিকে।

শুধু কি গান! কতো বিচিত্র কথা তার মুখে। যে কথা ছন্দ দিয়ে গেঁথে গান রচনা করে। তারপর একতারা বাজিয়ে সুর দেয় সেই গানে। নিজে শোনে, অপরকে শোনায়। গানের মধ্যে ডুবে কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, আবার কখনো ভাব-সমাধিতে ডুবে যায়।

একদিনের ঘটনা!

বাংলার রাঢ় অঞ্চলে কোনো এক গ্রামের হাটচালায় আশ্রয় নিয়েছে লালন। সেদিন ছিল দুর্যোগের রাত। হাটচালার কোণে কোনো মতে জড়োসড়ো হয়ে শুয়েছিল সে। গভীর অন্ধকার রাত। ক্ষণ বিদ্যুতের চমক সেই ভয়ংকর অন্ধকারকে মাঝে মাঝে স্পৃষ্ট করে তুলছিল।

ঘুম-ঘুম তন্দ্রায় আচ্ছন্ন লালন। তার তন্দ্রাতুর মনে স্বপ্নের পদসঞ্চার।

হয়তো সেই স্বপ্ন দেখার মুহূর্তে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। স্বপ্নে দেখলো দয়াকে। স্বপ্নে দেখা দয়ার মুখ। শীর্ণ-বিবর্ণ। দয়া শুয়ে আছে জীর্ণ মলিন শয্যায়। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে কাতর কণ্ঠে বলছে, ওগো, তুমি আসবে না? তোমাকে না দেখে যে মুক্তি পাচ্ছি না। তুমি না এলে আমাকে মুক্তি দেবে কে?

—দয়া, দয়া—

স্বপ্নের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে লালন।

আর সেই মুহূর্তে ভয়ংকর শব্দে দূরে কোথাও বাজ পড়ে। বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে ওঠে অন্ধকার।

সচকিত লালন উঠে বসে। বলে, আমি যাবো দয়া, যাবো তোমার কাছে।

তারপরেই চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

তবুও আর অপেক্ষা নয়, সেই দুর্যোগের রাতে লালন উদ্‌ভ্রান্তের মতো পথ চলতে শুরু করে। কিন্তু বাড়ি তো তার একদিনের পথ নয়।

অন্ধকার রাত। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইছে।

এই ভয়ংকর দুর্যোগের রাতেও পথ চলার বিরাম নেই লালনের। অন্ধকারের মধ্যেও সামনে দৃষ্টি রেখে সে এগিয়ে চলেছে।

তিন দিন। তিন রাত।

অবিরাম পথ চলে রাতের অন্ধকারে লালন এসে পৌঁছলো গৌরী নদীর পারে, আপন গ্রামে।

অন্ধকার রাত। সে রাতেও আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা। লালন এসে দাঁড়ালো গ্রামের সেই জীর্ণ কুটির প্রাঙ্গণে।

'মা' বলে ডাকতে গেল লালন। পারলো না। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে অজানা শঙ্কায়। জড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো উঠোনে।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দাওয়ায় উঠে এলো লালন।

ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। মৃদু বাতাসে প্রদীপের শিখা কাঁপছে। ঘুমিয়ে আছে দয়াবতী। ঘুমের মধ্যেও রোগ-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সে। দয়াবতীর পাশেই শুয়ে আছেন পদ্মাবতী।

ঘুম ভেঙে গেল দয়াবতীর। ঘুম ভাঙা মুহূর্তে কেমন যেন ভয়ার্ত কণ্ঠে ডাকলো, মা।

ডাক শুনেই আলগা ঘুম ভেঙে গেছে পদ্মাবতীর। জিজ্ঞাসা করেন, কি হলো বৌমা ?

—কেমন যেন ভয় করছে মা।

—কিসের ভয়।

পদ্মাবতী উঠে বসে প্রদীপের শিখাটা একটু উসকে দিলেন।

দয়াবতীকে কেমন যেন চঞ্চল মনে হয়। হাত বাড়িয়ে কি যেন ধরতে চাইছে।

পদ্মাবতীর মনের মধ্যেও ভয়। এমন তো কোনদিন করে না বৌমা। তবে কি ভয়ের স্বপ্ন দেখেছে। না আর কিছু।

—মা, মাগো।

—কি হয়েছে বৌমা? অমন করছো কেন?

—মা।

দয়াবতী হাপর টানার মতো নিঃশ্বাস নেয়। মাথাটা নাড়তে থাকে এদিক-ওদিক।

আর স্থির থাকতে পারে না লালন। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকে, মা—মা।

এ লগ্ন যেন অপ্রত্যাশিত।

তবুও এমনি একটি মুহূর্তের জন্যে দয়াবতী মনে মনে প্রার্থনা করেছিল ঈশ্বরের কাছে।

স্বামীকে দেখেই দয়াবতীর রোগ-যন্ত্রণা হারিয়ে যায়। তার ম্লান-বিবর্ণ মুখটাও যেন হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—দয়া। লালন অনুচ্চকণ্ঠে ডাকে।

দয়ার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। তবু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে চায়। দু হাত বাড়িয়ে দেয় স্বামীর দিকে। বলে, জানো—একটু আগে স্বপ্ন দেখেছি, কালো ছায়া ছুটে আসছে আমার দিকে। ভীষণ কালো সে ছায়া।

লালন ঝুঁকে পড়ে দয়ার মুখের কাছে। তার দ্রুত নিঃশ্বাস দয়াকে উতলা করে তোলে।

—তুমি আমার ডাক তবে শুনতে পেয়েছো? দয়ার কণ্ঠে জড়ানো আকুলতা, তোমাকে কতবার ডেকেছি। ভেবেছি, তুমি কি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছো না।

—দয়া।

কোনো কথা শোনার যেন সময় নেই দয়াবতীর। নিজের কথাই শুধু শোনাতে চায়। বলে, তুমি এমন ধরাচূড়ো পরেছো কেন? সন্ন্যাসী হয়েছো?

—না দয়া।

—তবে! দয়া তার একখানি হাত স্বামীর মুখের কাছে নিয়ে যায়। বলে, তবে বিবাগী হয়ে বৈরাগীর বেশ পরেছো!

পদ্মাবতী বসেছিলেন এত সময়। এবারে চোখের জল ফেলতে ফেলতে উঠে যান বাইরে।

লালন বলে, দয়া, আমি কি হয়েছি, তা আমি নিজেই জানি না। যে কথা নিজে জানি না, সে কথা তোমাকে বলবো কেমন করে। কিন্তু দয়া, তোমার কি হয়েছে?

—কি হয়েছে, দেখেও বুঝতে পারছো না? দয়াবতী তু' চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবে। তারপর বলে, প্রদীপটা কাছে নিয়ে এসো। অত দূরে আলো, তোমাকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না।

—দয়া!

—ওগো, আমি যে উঠতে পারি না। নয়তো তোমার মুখ দেখতে আমিই তো প্রদীপ তুলে ধরতাম।

পিলসুজের ওপর জ্বলছে মাটির প্রদীপ। প্রদীপটা তুলে নেয় লালন। আপন মুখের কাছে তুলে ধরে। নিঃশ্বাসে দীপ শিখাটা থরথর করে কাঁপছে।

দয়া এবারে চঞ্চল হয়ে ওঠে। পুরোনো যন্ত্রণাটা আবার ওর দেহকে তুমড়ে-মুচুড়ে দেয়। উতলা কণ্ঠে বলে, তুমি এত কাছে, অথচ তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন! ওগো—আমি কি অন্ধ হয়ে গেলাম।

—দয়া, অমন করছো কেন! দয়া।

দয়াবতী তু' চোখ বন্ধ করে। ভাঙা ভাঙা স্বরে বলে, ওগো তু'চোখ বন্ধ করে তোমাকে মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমার এই সুন্দর স্বপ্নটা ভেঙে দিও না।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত কাটে। এক-একটি মুহূর্ত যেন এক একটি যুগ।

দয়ার তু' চোখ তখনো বন্ধ। লালন এক হাতে প্রদীপ ধরে, আর এক হাত আলতো ভাবে দয়ার মাথায় বুলিয়ে দেয়।

আচমকা কি যে হয় দয়ার, পাশ ফিরে শোয়। তারপর তু হাতে ভর করে মাথাটা তুলে দেয় স্বামীর কোলে। কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বলতে পারে না। শুধু হাপর টানার মতো বার বার নিঃশ্বাস নেয়।

লালনের কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। ও বুঝতে পারে দয়ার অন্তিম মুহূর্ত এগিয়ে আসছে।

দয়াবতীর দেহটা এবারে অদ্ভুত ভাবে কেঁপে ওঠে। তু' চোখ মেলে

ফিরে চায় স্বামীর মুখের দিকে। দুটি শীর্ণ হাত তুলে কি যেন বলতে চায়। কিন্তু পারে না।

—দয়া! দয়া!

উত্তর আসে না। দয়াবতীর দেহটা অদ্ভুত ভাবে কেঁপে উঠে স্থির হয়ে যায়। লালন আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, দয়া—দয়া, কথা বলো দয়া।

ছুটে আসেন পদ্মাবতী। এসেই চিৎকার করে ওঠেন, বৌমা-বৌমা—

দয়াবতীর মাথাটা কোলের ওপর থেকে নামিয়ে রাখে লালন। গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়।

—মা!

পদ্মাবতী বুকে জড়িয়ে ধরেন লালনকে।

—মা!

পদ্মাবতীর কণ্ঠ কান্নার আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

—মা। মাগো।

—কাঁদতেও ভুলে গেছি লালন।

লালনের দু' চোখে জলবিন্দু। বলে, মা, এবারে আমাকে বিদায় দাও, আমি যাই।

—লালন!

—রাতের অন্ধকারে এসেছিলাম, রাতের অন্ধকার থাকতেই চলে যাবো। কাক-পক্ষীও জানতে পারবে না আমার কথা।

—তুই একথা বলছিস কেন?

—না বলে উপায় কি মা! লালন চোখের জল মোছে। বলে, আমার দয়ার আজ আর কোন জাত নেই মা। ও সব কিছুর বাইরে চলে গেছে।

পদ্মাবতী নীরব। তাঁর গণ্ড বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

লালন এবারে দয়াবতীর কাছে আসে। তুলে ধরে মুখখানাকে। বলে, আমি যাচ্ছি দয়া। যাবার সময়ে তুমি কিছু বলবে না! এতো অভিমান তোমার?

এবারে অশান্ত কান্নার আবেগে ভেঙে পড়ে লালন। তবু সে উঠে দাঁড়ায়। মাকে প্রণাম করে নিঃশব্দে ঘরের বাইরে চলে যায়। পদ্মাবতী একবার চিৎকার করে ডেকে উঠে চুপ করে যান।

বাইরে তখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে হারিয়ে যায় লালন।

আবার নদী তীরের পথ ধরে লালন একদিন পৌঁছয় ফুলবাড়ি গ্রামে সিরাজ সাঁই-এর আখড়ায়।

এই আখড়া থেকেই একদিন বাউলের বেশে পথ-পর্যটনে বেরিয়েছিল লালন। সেদিন সিরাজ সাঁই নিজের হাতে লালনকে পরিয়ে দিয়েছিল বাউলের বেশ। হাতে তুলে দিয়েছিল একতারা আর খঞ্জনি।

দীর্ঘ এক বছর বাদে আবার ফুলবাড়ি গ্রামের সাঁইজীর আখড়ায় ফিরে এলো লালন।

যেদিন গিয়েছিল, সেদিন ওর মনের মধ্যে ছিল নতুন এক আশার আলো। মনের গভীরে ছিল হাজার বাতির রোশনাই।

আর আজ?

আজ ফিরে এসেছে অবসন্ন মনে। ওর মনের অঙ্গনে যে আলো জ্বলে ছিল, নিবে গেছে ঘটনার আবর্তে।

অনেকদিন পর লালনকে পেয়ে সিরাজ তাকে দু'হাতে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। বলে, কি রে! একটা বাঁধন ছিড়লো তো?

লালন নীরবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সিরাজ মৃদু হেসে বলে, কি হলো তোর! কথা বলছিস না কেন?

লালন তবুও নীরব।

সিরাজ বলে, সব সময়ে নজর রাখবি সামনে। পিছন দিকে ফিরেও চাইবি না। সামনে অনেক রাস্তা পড়ে আছে—জীবন ভোর সেই রাস্তায় চলবি। দেখবি, কতো আনন্দ।

—সাঁইজী!

লালন কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারে না।

—সাঁইজীকে কিছু বলে দিতে হয় না। লালনের পিঠে মৃদু করাঘাত করে সাঁইজী বলে, এখনো মায়ার ঘোরে পড়ে আছিস তুই। ও সব মিছে

মায়া। মায়ার জালে জড়িয়ে থাকবে সংসারের ঘানিটানা মানুষগুলো। তোর কাঁধে তো সংসারের জোয়াল নেই। তবে আর কি। একতারা হাতে তুলে এন্তার বাজিয়ে যা। অমন মজা আর কিছুতে নেই। ওই একতারার তারে বাঁধা জীবনের সুর। সেই সুরের মধ্যে বাঁধা আছেন রসুল।

লালন ফিরে চায় সাঁইজীর মুখের দিকে।

সিরাজ চেপে ধরে লালনের হাত। বলে, আয় আমার সঙ্গে।

সন্ধ্যা হয়েছে।

সাঁইজীর নিভৃত আখড়ায় ভক্তজনেরা সমবেত হয়েছে। ছোট একটা লণ্ঠন ঝুলছে বটের ঝুরিতে। স্বল্প আলোয় আলোকিত আখড়ার প্রাঙ্গণ। সাঁইজী বসে আছে সাধন-বেদীর ওপর।

ভক্তজনের মধ্যে লালনও বসে আছে। সবাই অবাক হয়ে শুনছে সাঁইজীর তত্ত্ব-কথা।

সাঁইজী বলছে, এই যে আমি বসে আছি তোদের সামনে, বলতে পারিস এই আমিটা কে?

কোন উত্তর আসে না।

সাঁইজী আবার বলতে আরম্ভ করে, আমার 'আমি'র কথা বলতে গেলে আগে দেহটার কথা বলতে হয়। দেহটাকে বাদ দিয়ে তো আমি নয়। কিন্তু আজব কথা কি জানিস—দেহটা থাকে না, 'আমি'টা থাকে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানিস, যে দেহ আশ্রয় করে 'আমি'টা বাস করে, দেখবি একদিন এই আমিটা খাঁচা ছেড়ে উড়ে পালিয়েছে। পড়ে আছে এই নড়বড়ে দেহটা। যে দেহটায় আমার বাস, সেই দেহটাই তখন হয়ে যাবে জঞ্জাল। তারপর সেই দেহটাকে হয় মাটির নিচে চাপা দিবি, না হয় শ্মশানে পোড়াবি। আর বেঘোরে মরলে শেয়াল শকুনে ছিঁড়ে খাবে। ফল একই। পঞ্চভূতে মিশে যাবে দেহটা। কিন্তু এই আমিটা তখন কি করবে বল তো?

—'আমি' আবার কি করবে? সে তো সব ক্রিয়া-কর্মের বাইরে।

উত্তর আসে কাঙাল হরিনাথের মুখ থেকে। আখড়ার বেড়া পেরিয়ে কাঙাল হরিনাথ এদিকেই আসছেন।

কাঙালকে দেখেই সাঁইজী উঠে দাঁড়ায়। বলে, কাঙাল! তুমি অসময়ে এদিকে?

—সময়ে আসি, আজ অসময়ে এলাম। কাঙাল হরিনাথ হেসে বলেন, এ-তো বেশ মজার খাশমহল বানিয়েছো দেখছি। তারপর বলো, কি বলছিলে। শুনি তোমার তত্ত্ব-কথা।

—আজ আর কথা-টথা নয় কাঙাল। সিরাজ সাঁই বলে, তার চেয়ে তোমার গান শোনাও। তুমি তো বাবা বহুরূপে ফেরো, কখনো কাঙাল, কখনো ফিকির চাঁদ, কখনো ভূতের ভূত গো-ভূত।

কাঙাল উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠেন। বলে, সাঁইজী, তিন কাল পুড়িয়ে তো তুমি ভূতের বাবা হয়ে বসে আছো। এখন ভাবনাটা শুধু এন্তেকালের। তাই না?

কথা শেষ করেই কাঙাল হরিনাথ গান ধরেন—

রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন,
একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
এই যে আমার-আমার, সব ফক্কিকার,
কেবল তোমার নামটি রবে;
হবে স'ব লীলা সাঙ্গ, সোনার অঙ্গ
ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।

কাঙালের গান শেষ হলো। তারপর জনেজনে প্রসাদ বিতরণের পালা। সামান্য বাতাসা প্রসাদ।

এবারে এক-এক করে আখড়া থেকে বিদায় নেয় সবাই। কাঙাল হরিনাথও চলে যায়।

শূন্য আখড়ায় বসে থাকে লালন আর সিরাজ সাঁই।

উন্মনা লালন পথ চলছে।

পরনে তার বাউলের পোশাক, হাতে একতারা আর খঞ্জনি। মাথায় চূড়ো করে বাঁধা চুল। কাঁধে নক্সি কাঁথার ঝোলা।

ফকির বাউলের যা ধর্ম। সকাল হতেই সিধে সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে।

হঠাৎ একটা পুকুর পাড়ে এসে লালন থমকে দাঁড়ালো। লক্ষ্য করলো, পুকুরে পদ্মবনের মধ্যে জল তোলপাড় করছে।

কাছে গেল। দেখলো, দুটি কোমল হাত মুহূর্তে জলের ওপরে উঠে ডুবে গেল।

কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না লালন। নামিয়ে রাখলো ঝোলাঝুলি, একতারা। ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে।

ডুব সাঁতার দিয়ে লালন দু হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে তুলে আনলো সুন্দরী তরুণীর অর্ধ-অচেতন দেহ। শুইয়ে দিলে বাঁধানো ঘাটের ওপরে। অনুভব করলো নিঃশ্বাসের গতি-প্রকৃতি। তারপর দু হাতে ধরে তরুণীকে উপুড় করিয়ে পা দুটি ওপরের দিকে তুলে দিলে। খানিকটা জল বমি করলে তরুণী।

এবারে দু'হাত দিয়ে তরুণীকে বসিয়ে দিলে।

লালন চিনতে পারে তরুণীকে। এর আগে ওকে দেখেছে নদীর কিনারায়।

সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগলো। লালন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তরুণীর সুন্দর মুখের দিকে। যার কোমল-তনু ওর দু'বাহুর বন্ধনে।

তরুণী চোখ মেলে তাকালো। পলকের দেখা। আবার দু' চোখ বন্ধ করলো সে।

লালন জিজ্ঞাসা করে, কষ্ট হচ্ছে?

—না। বলে আবার ফিরে চায় তরুণী। হয়তো এবারে কিছুটা লজ্জা আসে তার মনে। অসম্বৃত বেশ-বাস গুছিয়ে নিতে যায়।

—তোমাকে এর আগেও দেখেছি। লালন বলে, এই গাঁয়েই তো বাড়ি?

—হ্যাঁ।

—তোমার নাম কি?

—কেউ ডাকে মোতি, কেউ ডাকে সাকিনা।

—আমি ডাকবো সাকিনা বলে। সাকিনা, ভারি মিষ্টি নাম।

—সাকিনা মাথা নিচু করে হাসে। বলে, তোমাকেও আমি চিনি বাউল।

—চেনো!

সাকিনা মুখ তোলে। চার চোখে মিলন হয়।

লালন নিজেকে সহজ করতে চায়। বলে, সাঁতার জানো না তবে গভীর জলে যাওয়া কেন ?

—পদ্ম তুলতে। সাকিনার মুখে অর্থপূর্ণ হাসি। বলে, আর না ডুবলে কি তোমাকে এমন করে পেতাম।

কথার শেষে সাকিনা নতুন করে ফিরে তাকায় লালনের মুখের দিকে।

— তবে তোমার জলে ডোবা মিথ্যে ?

—আজ এর চেয়ে সত্যি কিছু নেই। তোমাকে তো পেয়েছি।

সাকিনার কাজল-আঁকা ডাগর নয়নে কি যেন এক মায়া জড়ানো। তার কালো চোখের তারায় লালনের প্রতিবিম্ব।

সাকিনার তু' চোখে আপন প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করে লালন। বলে, আমি যে বাউল, পথকে করেছি সার—আমাকে ভালোবেসে কি পাবে তুমি ?

সাকিনার মুখে কোনো কথা নেই। শুধু তার ঠোঁট তুটি কেঁপে ওঠে কিছু বলতে চাওয়ার ইচ্ছেয়।

— এবারে তুমি ঘরে যাও সাকিনা।

সাকিনা বলে, যদি না যাই !

—কেন যাবে না ? লালন বলে, পথের ধারে এমনি করে আমায় নিয়ে বসে থাকলে লোকের চোখে পড়বে না ? যাও।

সাকিনা উঠে দাঁড়ায়। সিক্তবসন গুছিয়ে নেয়। তারপর লালনের দিকে একবার বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফিরে চলে আপন ঘরে।

দিন কয়েক পরের কথা।

নদীপারে পরিচিত বাবলা গাছের ছায়ায় বসে লালন মনের আনন্দে একতারা বাজিয়ে চলেছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। একতারার সুরে সে এমনই তন্ময় হয়ে গেছে।

জল ভরতে এসেছে সাকিনা। একতারার ঝংকার তার কানে গেছে। কলসি কাঁখে চপল ছন্দে ছুটে আসে। তবু চমক ভাঙে না লালনের। শেষটা কলসি মাটিতে নামিয়ে রেখে বিচিত্র ভ্রূ-ভঙ্গি করে কোমরে হাত দিয়ে লালনের সামনে দাঁড়ায়।

—তুমি ! লালনের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

—হ্যাঁ গো হাঁ, সাকিনা বলে, কেন চিনতে পারছো না বাউল ?

—পারছি বৈকি ! লালন মৃদু হেসে অন্তরঙ্গ স্বরে বলে, জল ভরতে এসেছো ?

—যদি বলি, না। সাকিনা চটুল ভঙ্গিতে বলে, জল ভরার ছলে তোমাকে দেখতে এসেছি।

লালন এবারে নীরব।

—কি গো বাউল, চুপ করে রইলে কেন ? কি দেখছো আমার মুখের দিকে চেয়ে ?

লালন হঠাৎ কেমন যেন উন্মনা হয়ে যায়। সাকিনার মুখের মধ্যে সে যেন আর একটি মুখ দেখতে পায়। সে মুখ দয়াবতীর।

—কি ভাবছো ?

—কিছু না। বলে চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে লালন।

—বললে না তো, অমন করে কি দেখছো আমার মুখের দিকে চেয়ে ?

লালনের মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাসির রেখা। বলে, বাউলের ঘর বাঁধতে নেই সাকিনা।

—জানি।

সাকিনা আরো কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারে না। দূর থেকে উচ্চকণ্ঠের চিৎকার ভেসে আসে। লালনের নাম ধরে কে যেন ডাকছে।

চঞ্চল হয়ে ওঠে লালন। উঠে দাঁড়ায়। দেখতে পায় নদীতীরের পথ ধরে শীতল দাস এদিকেই আসছে !

সাকিনা আর দাঁড়ায় না। কলসি কাঁখে নিয়ে দ্রুত পদে চলে যায়।

শীতলদাস কোনরকম ভূমিকা না করেই বলে, লালন শীগ্‌গির এসো। সাঁইজীকে বোধ হয় আর ধরে রাখা যাবে না।

—কি বলছো শীতল ভাই ?

—হ্যাঁ, শুধু তোমার কথা ছাড়া মুখে আর কোন কথা নেই। বলছে, লালনকে ডাক—সে না এলে আমি যে ছুটি পাচ্ছি না।

সাঁইজীর আখড়ায় অগণিত মানুষের ভিড়। সাধন-বেদীর ওপর শুয়ে আছে সাঁইজী। সাঁইজীকে ঘিরে ভক্তজনেরা।

—কই রে, লালন এলো না ?

—এই তো আমি !

ভিড় ঠেলে সাঁইজীর কাছে আসে লালন।

—কোথায় ছিলি রে তুই ? সাঁইজীর কণ্ঠস্বর অনুচ্চ। বলে, সবাই এসে গেল এলো না শুধু কাঙাল। মনে মনে তাকে এতো ডাকছি—ডাক কি তার কানে যায়নি ?

—সাঁইজী, কি হয়েছে তোমার ?

—কি আবার হবে, ছুটির দিন এসেছে।

—সাঁইজী ! লালন ঝুঁকে পড়ে সাঁইজীর মুখের কাছে। সাঁইজীর মুখে বিচিত্র হাসির রেখা। বলে, আমাকে একবার বসিয়ে দে তো লালন।

—সাঁইজী !

—যা বলছি শোন।

লালন দু' হাতে ধরে সাঁইজীকে বসিয়ে দেয়। সাঁইজী তার মাথাটা লালনের বুকের ওপর রাখে।

ভক্তজনেরা কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেছে। সবাই অবাক হয়ে চেয়ে আছে সাঁইজীর মুখের দিকে। কারো কারো চোখে জল।

কিন্তু মৃত্যুর দরজায় পৌঁছেও সাঁইজীর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়নি।

সাঁইজী ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট সুরে বলতে থাকে, ওরে—যাবার সময় হলে সবাইকে যেতে হয়। কেউ তো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে আসে না। আগে আর পিছে—নয়তো ডাক এলে যেতে হবেই।

ভক্তজনের চোখে জল ঝরে। হিন্দু-মুসলমান সবাই এসেছে তাদের প্রিয় সাঁইজীকে দেখতে।

সাঁইজী বলে, ওরে দেহটা হলো দেবতার ঠাঁই। আমিটা হলো চৈতন্য-রূপী দেবতা। দেহটাকে মন্দির জ্ঞান করবি। কিন্তু পুজো করবি সেই আমিটার। বুঝলি।

সাঁইজীর দৃষ্টি ভক্তজনকে স্পর্শ করছে বারবার। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সাঁইজী বলে, আমার 'আমি', তোমার 'তুমি'—দুয়ের মধ্যে ফারাক কিছু নেই। সবার মধ্যেই সেই রসুলের বাস।

হঠাৎ গানের সুর ভেসে আসে। কণ্ঠ সংগীত কাঙাল হরিনাথের

'হরি, দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো, পার কর আমারে,
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা ডাকছি হে তোমারে।'

গাইতে গাইতে কাঙাল হরিনাথ এসে দাঁড়ালেন সাঁইজীর সামনে।

সাঁইজীর মুখে-চোখে গভীর প্রশান্তি।

গান গাইতে গাইতে কাঙাল হরিনাথ সাঁইজীর আরো কাছে এগিয়ে আসেন।

—তুমিই আগে টিকিট কাটলে সাঁইজী?

কথা নেই সাঁইজীর মুখে। শুধু অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কাঙাল হরিনাথের মুখের দিকে।

হরিনাথ বলেন, যাও—পারো তো আমার জন্যে তোমার কাছাকাছি একটু জায়গা রেখো।

সাঁইজীর দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসে। নিঃশ্বাস দ্রুত হয়। দুটি হাত আপন বুকের কাছে রাখে।

কাঙাল হরিনাথের দু'চোখে জল ঝরে। জল ঝরে লালনের চোখে।

সাঁইজীর দেহটা কেমন যেন শিউরে উঠে। তারপরেই স্থির হয়ে যায়।

ভক্তজনেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সাধন-বেদীর ওপর লালন শুইয়ে দেয় সাঁইজীকে।

জীবনের ওপারে পৌঁছে সাঁইজীর চোখে-মুখে প্রশান্তির চিহ্ন।

সেদিন সন্ধ্যা।

সিরাজ সাঁই-এর কবরের পাশে বসে আছে লালন। উন্মনা হয়ে কি যেন ভাবছে।

পাশেই পড়েছিল একতারাটা। এবারে একতারা তুলে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করে লালন।

একতারার সুরের সঙ্গে লালনের কণ্ঠ মিশে যায়। লালন গায়,

'আমার দিন কি যাবে এই হালে।'

গান শেষ হয়। লালনের দু'চোখে তখন জল টলমল করছে। সে জল বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে মাটিতে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হয়ে এসেছে। তবুও সেই একই ভাবে বসে আছে। কখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে এসেছে সাকিনা, সে খবর জানে না লালন।

—তুমি কাঁদছো বাউল?

সাকিনার কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙে লালনের। সামনেই সাকিনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে, তুমি?

সাকিনা কাছে এগিয়ে আসে। নিবিড় হয়ে দাঁড়ায়।

—চিনতে পেরেছো তাহলে?

—চেনা মুখ কি চিনে নিতে ভুল হয় সাকিনা? লালন মৃদু শব্দ করে হাসে। বলে, সন্ধ্যের পর আমার কাছে আসতে ভয় করেনি?

—কিসের ভয় বাউল? সাকিনা বলে, তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি, সেদিন থেকে আমার লজ্জা ভয় সব চলে গেছে।

—কিন্তু আমি তোমাকে কি দিতে পারি? আমার যে কিছুই নেই।

—তুমি তো আছো।

—আমি তো আছি। লালন ক্ষণকাল চুপ করে থাকে। তারপর নিস্পৃহ সুরেই বলে, তুমি কি চাও আমার আমিকে সঁপে দিয়ে একেবারে ভিখিরি হয়ে বসে থাকি। না না, সে হয় না সাকিনা।

—কেন হয় না! সাকিনা বসে পড়ে লালনের সামনে। আকুল নয়নে ফিরে চায় লালনের মুখের দিকে। বলে, আমাকে ফিরিয়ে দিও না বাউল।

লালন বলে, আমাকে ভাবতে দাও সাকিনা।

—বেশ, তুমি ভাবো। সাকিনা বলে, আমার কিন্তু সব ভাবনা শেষ।

—দিন কয়েক পরে আরো এক রাতের ঘটনা।

সে রাতে আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ। লালন গিয়েছিল নদী পারে। পারাপারের ডিঙিতে এপারে ফিরে এলো যখন, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

খেয়াঘাটে নামলো লালন। ঘাট থেকে আখড়া -সামান্য পথ। আপন মনে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে লালন আখড়ায় ফিরছে।

আখড়ার কাছে পৌঁছেই লালন দেখতে পায় এক অস্পষ্ট মূর্তি হাসনু-হানা গাছটার আড়ালে সরে গেল। অস্পষ্ট হলেও লালনের মনে হয়—যেন দয়াবতীর ছায়ামূর্তি দেখেছে সে।

থমকে দাঁড়ায় লালন। লক্ষ্য করে। না কিছু নেই!

তবে কি চোখের ভুল?

নিঃশব্দে হাসনু-হানা গাছটার দিকে এগিয়ে যায় লালন। না—চোখের ভুল নয়, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে হাসনু-হানার ঘন-পল্লবের আড়ালে।

—কে! কে ওখানে!

এগিয়ে যায় লালন। ছায়া মূর্তি স্পষ্ট হয়। দাঁড়িয়ে আছে সাকিনা।

—সাকিনা! তুমি এত রাতে?

—তোমার জন্য আমার কাছে দিন রাত সব এক হয়ে গেছে। আকুতি জড়ানো কণ্ঠ সাকিনার! বলে, আর আমাকে ফিরিয়ে দিও না বাউল।

লালন নীরব।

—তুমি বাউল, দরজায় দরজায় ভিক্ষে করো—কিন্তু আমি শুধু তোমার দরজায় হাত পেতেছি। তোমার কাছ থেকে ফিরে গেলে আমার যে সব যাবে।

লালনকে উন্মনা মনে হয়।

—কি ভাবছো! সাকিনা এসে দাঁড়িয়েছে লালনের মুখোমুখি। বলে, তুমি ফিরিয়ে দিলে আমি জলে ডুবে মরবো বাউল।

লালন চমকে ওঠে। ফিরে তাকায় সাকিনার সুন্দর মুখের দিকে।

চাঁদের আলো পড়েছে সাকিনার মুখে। সে আলোয় তার সুন্দর মুখখানা আরো সুন্দর হয়েছে।

লালন একবার চাঁদের দিকে চায়, তারপর চোখ ফিরিয়ে নেয় সাকিনার মুখের ওপর।

—সাকিনা। লালনের কণ্ঠ আবেগরুদ্ধ। বলে, তুমি এত সুন্দর!

সাকিনা গভীর আবেশে লালনের বুকে মাথা রাখে। লালন দুহাতে তুলে ধরে সাকিনার মুখ।

সাকিনার সুন্দর মুখ তার চোখের সামনে। কিন্তু কি আশ্চর্য—সে

মুখ ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে দয়াবতীর মুখ। ফুলশয্যার রাতে দয়া যে সাজে যেমন করে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তেমনি করে এসে দাঁড়িয়েছে সাকিনার অবয়বে।

—দয়া ?

কাতর আর্তনাদের মতো শোনায় লালনের কণ্ঠস্বর।

—কি হলো! সাকিনার কণ্ঠেও ব্যাকুল বিস্ময় জড়ানো, কাকে ডাকছো ?

সম্বিৎ ফিরে আসে লালনের। শান্ত হয়ে যায়। বলে, তুমি আমাকে একা থাকতে দাও সাকিনা। এমনি করে আমার স্বপ্ন ভেঙে দিও না।

সাকিনা কেমন যেন হতবাক হয়ে যায়। কি বলবে ভেবে পায় না। সজল চোখে চেয়ে থাকে লালনের মুখের দিকে। তারপর 'আমি এখন যাচ্ছি' বলে চলে যায়।

রাতে।

ঘুম নেই লালনের চোখে। যতোবার তন্দ্রা আসছে, ততোবার তন্দ্রা টুটে যাচ্ছে। একটা অস্থির যন্ত্রণা মনের মধ্যে।

উঠে বাইরে আসে লালন। সাঁইজীর সাধন-বেদীর ওপর লুটিয়ে পড়ে। আকুল কান্নার সুরে বলে, এ তোমার কি পরীক্ষা লীলাময় ?

সেই নিস্তব্ধ রাতে লালনের কান্নার সুর সমগ্র পরিবেশকে ব্যথিত করে তোলে।

কি জানি কি যাদু আছে সাধন-বেদীতে, অশান্ত লালন শান্ত হয়ে যায়। বেদীর মৃত্তিকা শয্যায় ঘুমিয়ে পড়ে।

সুন্দর স্বপ্নের মধ্যে ঘুম ভেঙে যায় লালনের। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখেছে—সিরাজ সাঁই এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। বলছে, লালন—তুই নিজেও কাঁদলি, পরকেও কাঁদালি। ভালোবাসার চেয়ে ভালোবাসা পাওয়া কঠিন রে। তুই তার অমন ভালোবাসা পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিলি ? বুঝতে পেরেছি, তুই দয়াবতীকে ভুলতে পারছিস নে। যা ভোলার নয়, তা কি ভোলা যায় রে!

—তবে কি করবো সাঁইজী।

—সাকিনার মধ্যেই তুই দয়াবতীকে খুঁজে পাবি।

—সাঁইজী !

স্বপ্নের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে লালন। ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙা মনেও সেই স্বপ্নের রেশ।

কিন্তু কোথায় সাঁইজী !

চারদিকে দৃষ্টিপাত করলো লালন। কেমন যেন শূন্যতা বিরাজ করছে সমগ্র পরিবেশ জুড়ে।

সাধন-বেদীর ওপর ঝরে পড়েছে অজস্র শিউলি। মুঠো মুঠো শিউলি ফুল কুড়ালো লালন। ঘ্রাণ নিলে সে ফুলের। তারপর মুঠোয় ভরা ফুলগুলো ছড়িয়ে দিলে বেদীমূলে।

রাত শেষ হয়ে আসছে। ভোরের আলো ফুটতে আর দেরি নেই।

অবসন্ন দৃষ্টিতে পুব আকাশের দিকে তাকালো লালন। পূবের আকাশে আলোর ইশারা।

একতারা আর খঞ্জনি হাতে নিলে লালন। কাঁধে ঝোলালো নক্সি কাঁথার ঝোলা। তারপর আখড়া ছেড়ে নদী তীরের পথ ধরলো।

একতারার সুরে সুর মিলিয়ে লালন গাইছে,

'আজ ব্রজপুরে কোন্ পথে যাই,
ও তাই বল রে স্বরূপ বল রে তাই।
আমার মনের সাথী আর কেহই নাই।

লালন ভিক্ষার জন্য পথে বেরিয়েছে। ভিক্ষা নইলে বাউলের যে দিন চলে না।

নদী তীরের পথ ছেড়ে গ্রামের পথ ধরলো লালন। গ্রাম প্রান্তে একটি ছোট কুটির। কুটির অঙ্গনে দাঁড়িয়ে লালন গাইলো,

কোথায় রাধে কোথা কৃষ্ণধন,
কোথায় যে তার সব সখীগণ,
আর কতদিন চলিলে সে চরণ পাই।

গানের মধ্যে সাকিনা এসে দাঁড়ায় কুটির অঙ্গনে। লালনের কিন্তু সে দিকে কোনো খেয়াল নেই। গানের ভাবে সে এমনি বিভোর।

আবার ঘরে যায় সাকিনা। সিধে সাজিয়ে বাইরে আসে। লালনের সামনে দাঁড়ায়।

সাকিনাকে চোখের সামনে দেখেই লালন বিস্মিত সুরে বলে ও[...] তুমি!

সাকিনা চুপি স্বরে বলে, ভিক্ষে নেবে না বাউল?

লালন তার ভিক্ষের ঝুলি প্রসারিত করে। সাকিনার দানে পূর্ণ হয় তা[...] ঝুলি। বলে, দক্ষিণা দেবে না?

সাকিনা বলে, সে তো আগেই দিয়েছি।

লালন মৃদু হাসে। সে হাসির স্পর্শ সাকিনার মুখেও। চার চোখে[...] মিলন হয়। যে ভাষা মুখ ফুটে বলা যায় না, সে ভাষা স্পষ্ট হয়ে ফোটে[...] চোখের ইশারায়।

—সাকিনা এবার ঘরে যাও।

সাকিনা, তবুও দাঁড়িয়ে থাকে।

—আর কিছু বলবে সাকিনা?

—না। সাকিনার কণ্ঠস্বর অনুচ্চ, এবং ভাঙা ভাঙা। বলে, আমার কথ[...] শেষ হয়ে গেছে বাউল।

কাঙাল হরিনাথের বাড়ি। সুন্দর ছিমছাম। পরিবেশ জুড়ে এক অদ্ভুত[...] নীরবতা।

বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। বাগানের একান্তে দুটি চালাঘর। একটি[...] হরিনাথের আশ্রয়, অপরটিতে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

হরিনাথ পুজোয় বসেছেন। নিবিষ্ট মনে ধ্যান করছেন। রাধাকৃষ্ণের[...] ঘরের দরজায় পাড়ার কয়েকজন ভক্ত নরনারী বসে আছে।

পুজো শেষ হলো। পূজান্তে হরিনাথ প্রসাদের ডালা হাতে বাইরে[...] বারান্দায় এলেন।

প্রসাদ বিতরণ করছেন কাঙাল হরিনাথ। এরই মধ্যে এক সময়[...] লালন এসে দাঁড়ায় দু' হাত প্রসারিত করে। হরিনাথের মুখে ফুটে ওঠে[...] প্রশান্ত হাসি।

লালনের মুখেও হাসির স্পর্শ। বলে, কই গো বাবা ফিকিরচাঁদ— প্রসাদ দাও।

হরিনাথ বলেন, এই প্রসাদে কি তোমার মন উঠবে? যাক, তারপর হঠাৎ পথ ভুলে নাকি?

লালন বলে, ভাবছি—এবার থেকে তোমার কাছাকাছি থাকবো।

হরিনাথ এবারে হেসে উঠলেন, তাহলে তো ভালোই হয়। দু'সন্ধ্যে দেখা হয় দুজনে। কিন্তু তা-তো হবার নয়। যাক, এখন বোসো দিকি আরাম করে! তারপর নিরিবিলি বসে তোমার কথা শুনবো।

লালন বলে, আজ তোমার কথাই শুনতে এসেছি কাঙাল। এই ছাখো—হঠাৎ ভুল করে 'তুমি' ডেকে ফেলেছি।

কাঙাল বলেন, কাছের মানুষকে তো 'তুমি' বলেই সম্বোধন করে বাউল। যাক, শোনো—আজ আমি তোমার কথা শুনবো। তুমি বাউল মানুষ, সাঁইজীর চেলা—আমি তোমার কাছে রসের কথা শুনবো।

আজ লালন বলে, রসিক চূড়ামণির মন্দিরে দাঁড়িয়ে একথা বলতে তোমার মুখে আটকালো না? দেখছো না রাধার পাশে দাঁড়িয়ে কালাচাঁদ কেমন বাঁকা চোখে চেয়ে আছে। কোন্‌দিকে চেয়ে আছে বোঝবার জো নেই। কালো মানিক কিন্তু দেখছে রাধারানীকে।

—যা বলেছো। বলে হরিনাথ উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠেন।

—তোমার হাসিটা বড়ো ভালো। লালন বলে, আমি যদি অমন করে হাসতে পারতাম? চেষ্টা করেও পারি না।

কাঙাল হরিনাথের মুখে তখনো হাসির স্পর্শ।

লালন জিজ্ঞাসা করে, তোমার ঠাকুর কথা শোনে কাঙাল?

হরিনাথও তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, কথা শোনে কি না জানি না, তবে আমার ঠাকুর গান শুনতে ভালোবাসে।

—গান!

—হ্যাঁ গো গান। নতুন কি গান বেঁধেছো শোনাও না।

—আমার গান কি ঠাকুরের পছন্দ হবে!

বলে লালন ক্ষণকাল রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে। মুহূর্তে তার ভাবান্তর হয়। তার হাতের একতারাটা ঝংকৃত হয়। রাধা-কৃষ্ণের মন্দির অঙ্গনে লালন বিচিত্র ভাবাবেগে বিভোর হয়ে গান গাইতে আরম্ভ করে।

গানের সমুদ্রে বাউল-মন ডুবে যায়। গানের সমুদ্রে একবার ডুব দিলে

আর উঠে আসার কথা মনেই হয় না। সমুদ্রের নিচে ছড়িয়ে রয়েছে অনেক মুক্তো, অনেক রত্ন। বাউল-মন যে রত্নের সন্ধান করে।

অনেকদিন রহিমার কাছে আসেনি লালন। সেদিন কি মনে হলো, সোজা চলে এলো রহিমার কাছে।

অনেক দিনের ব্যবধানে লালনকে পেয়ে রহিমার আনন্দ ধরে না। ভেবেই পায় না, লালনকে নিয়ে সে কি করবে।

লালন বলে, মা, তোমার এই পাগল ছেলেটাকে একটু মানিয়ে নিও।

রহিমা বলে, মাঝে মাঝে একবার দেখা দিয়ে যেতে পারিস তো।

লালন বলে, আমি কিন্তু মনের মধ্যে তোমাকে ঠিকই দেখতে পাই। তুমিও দু' চোখ বন্ধ করে মনের আলোটা জ্বালিয়ে দিও—দেখবে তোমার পাগল ছেলে তোমার মধ্যেই বসে আছে।

রহিমার কাছে এ সব কথা দুর্বোধ্য মনে হয়। বলে, অতো শতো আমি বুঝি নে বাবা। আমার ইচ্ছে হয় তোকে দেখতে, তাই বলছি—মাঝে মাঝে আমাকে দেখা দিয়ে যাস।

লালন বলে, আসবো মা।

রহিমা বলে, ও তোর মুখের কথা।

লালন বলে, মনের কথাটাই তো মুখে ভাষা পায় মা। যাক গে ও সব কথা। এখন কি খেতে দেবে দাও। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছি তোমার কাছে আসবো বলে।

মোকসেদ উঠোনের কোণে বসে কি একটা কাজ করছিল। বলে ওঠে, তোমার আক্কেল বটে। ছেলেটা এলো এতো পথ হেঁটে, কোথায় তাকে বসতে বলবে, খেতে দেবে—তা নয়, তখন থেকে উঠোনে দাঁড়িয়ে বকবক করছো।

রহিমা লজ্জিত হয়। বলে, আয় বাবা— ঘরে এসে বোস।

খেতে বসেছে লালন। রহিমা তার পাশটিতে বসে। লালনের মুখেও খুশির চিহ্ন।

রহিমা বলে, আর ক'দিনই বা বাঁচবো। আমার কথা মনে রাখিস বাবা।

লালন বলে, মা—তুমি যে আমার মা। সন্তান কি মাকে ভুলতে পারে।

রহিমা চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে লালন তার ঝোলাঝুলি কাঁধে তুলে নেয়। হাতে নেয় একতারা।

রহিমা দেখে শুনে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে—একটু বিশ্রাম করবি না?

লালন বলে বাউলের জীবনে বিশ্রাম বলে কোনো কিছু নেই। তা ছাড়া অনেক পথ যেতে হবে।

—একটু বসবি না?

—না মা এবার আমি যাই।

রহিমা শূন্য দৃষ্টি তুলে ফিরে তাকায় লালনের মুখের দিকে।

লালন এবারে মাথা নিচু করে নেমে আসে উঠোনে। উঠোন পেরিয়ে পথে এসে চিৎকার করে বলে, আমি আবার আসবো মা।

আখড়ায় ফিরেই লালন দেখতে পায় সাকিনাকে। তারই অপেক্ষায় সাকিনা বসে আছে।

—সাকিনা! তুমি!

—চমকে উঠলে যে?

—কিন্তু! লালনের চোখে-মুখে একটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে। তারপরেই সাকিনার নিবিড় সান্নিধ্যে এসে দাঁড়ায়। বলে, সাকিনা—আমাকে নিয়ে নাই-বা স্বপ্ন দেখলে।

—স্বপ্ন আমি দেখি না। আমার কাছে তুমি দিনের আলোর মতো সত্যি।

লালন মৃদু হাসে।

—আজ আর তোমার কাছ থেকে ফিরে যাবো না বাউল।

—কিন্তু আমার এখানে কোথায় থাকবে। তা ছাড়া লোকেই বা বলবে কি?

—তুমি না বাউল! তুমি না সব কিছুর বাইরে!

সাকিনার কথা শুনে অবাক হয় লালন। ফিরে চায় তার সুন্দর উজ্জ্বল মুখের দিকে। বলে, তবু আর একবার ভেবে দেখো সাকিনা। বাউলের জীবনের পথ বড়ো আঁকাবাঁকা।

—আমি সেই পথেই যাবো।

—সেই পথেই যাবে?

—হ্যাঁ।

সাকিনা আশ্রয় খোঁজে লালনের বুকে। লালন দু' হাতের নিবিড় বন্ধনে সাকিনাকে আরো কাছে টানে।

সাকিনা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, চলো, আর কোথাও চলে যাই।

সাকিনার ভ্রমর-কালো চুলের ঘ্রাণ নিয়ে লালন বলে, তাই যাবো সাকিনা। তাই যাবো। তুমি পারবে—আজই এই অবস্থায় সব ছেড়ে আমার সঙ্গে চলে যেতে?

—সব ছেড়েই তো তোমার কাছে এসেছি বাউল।

লালনের দু' চোখ বন্ধ হয় গভীর আবেশে। তার মানসপটে তখন দূরের পথের প্রতিচ্ছবি। যে পথের পথিক বাউল সে। আর তার পথিক-সঙ্গিনী সাকিনা।

গ্রামের নাম সেউড়িয়া।

গ্রামের একান্তে পথের ধারে অশ্বত্থের নির্জন ছায়া।

চলতি পথে ক্লান্ত হয়ে অশ্বত্থের ছায়ায় এসে বিশ্রামের জন্যে দাঁড়ায় লালন আর সাকিনা।

জায়গাটা এক নজরে দেখে মুগ্ধ হয় সাকিনা। বলে, সুন্দর জায়গা না?

লালন বলে, বাউলের জীবনে অসুন্দর বলে কিছু নেই সাকিনা।

সাকিনা ফিরে ফিরে ছ্যাখে অশ্বত্থের নিবিড় ছায়ার দিকে। তারপর মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফিরে চায়, সামনের নদীর দিকে। বলে, এখানে ঘর বাঁধতে ইচ্ছে হচ্ছে বাউল।

—ঘর বাঁধার সখ কেন সাকিনা?

—পথের মধ্যে ঘর। সাকিনা বলে, তুমি 'না' বোলো না।

—পথের মধ্যে ঘর! লালনের কণ্ঠে সাকিনারই কথা। কথাটা বলেই

কেমন যেন উন্মনা হয়ে যায়। ভাবকাতর কণ্ঠে বলে, ঘর নয় সাকিনা—সে হবে এক আজব খেলাঘর।

—সত্যি বলছো? তুমি ঘর বাঁধবে বাউল?

—বাঁধবো বৈকি! সেই খেলাঘরের ঘরণী হবে তুমি। আমি গান বাঁধবো সেই ঘরে বসে, আর তুমি সেই গান গাইবে। তারপর—

লালন কি যেন খুঁজে পেতে চায় সাকিনার কালো-হরিণচোখে।

সাকিনার দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দৃষ্টি তার লালনের চোখের ওপর। যে চোখে নিবিড় তন্ময়তা।

অশ্বত্থের নিবিড় ছায়ায় লালন ঘর বাঁধলো। ছোট ঘর বাঁশের বাখারি দিয়ে ঘেরা। ওপরে খড়ের ছাউনি।

ঘরের সামনে খানিকটা জায়গা নিয়ে ফুলবাগান তৈরি করলো। বাগানে নানা জাতের ফুলের চারা রোপণ করলো লালন। ফুলের চারাগুলোকে সযত্নে লালন করে সাকিনা। যত্ন পেয়ে গাছগুলো কিছুদিনের মধ্যে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে।

সেদিন অপরাহ্নে লালন তার ছোট্ট কুটিরের বাইরে মাচার ওপর বসে একতারা বাজিয়ে চলেছে। একতারার সুরের মধ্যে তার কণ্ঠে নতুন গানের ভাষা জন্ম নিচ্ছে।

ভাব ভাষা আর ছন্দ। যার পূর্ণতা একটি গানে। আপন মনে গান রচনা করছে লালন। গানের ভাবে সে এমনি বিভোর, যে, কোনো দিকে হুঁশ নেই তার।

সামনের ছোট্ট বাগানে ফুলের চারায় জল সিঞ্চন করছে সাকিনা। আর মাঝে মাঝে আড়চোখে ফিরে দেখছে লালনের দিকে।

গান রচনা শেষ হলো। এবারে সুরের অলংকার পরালো গানে।

গান শেষ হয়। সাকিনা এসে দাঁড়ায় জলের ঝারি হাতে। বলে, সুন্দর।

—তুমি বলছো সাকিনা?

—হ্যাঁ। তোমার এ গান এ দেশের মানুষের মুখে মুখে ফিরবে। গানের মধ্যে তুমি চিরকাল বেঁচে থাকবে বাউল।

লালন মৃদু হাসে। বলে, তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হোক সাকিনা।

লোক মুখে খবর পেয়ে একদিন কাঙাল হরিনাথ এলেন লালনের নতুন আখড়ায়। এসে লালনের দেখা পেলেন না। দেখা হলো সাকিনার সঙ্গে।

সাকিনা আসন পেতে দেয় কুটির অঙ্গনে। কাঙাল মুখ টিপে হাসে সাকিনার মুখের দিকে চেয়ে। বলেন, তোমাকে চিনেছি মা। তুমি না হলে ক্ষ্যাপাকে আর এমন করে বাঁধতো কে? তা বেশ হয়েছে।

সাকিনা মাথায় ঘোমটা টেনে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে।

হরিনাথের দৃষ্টি চারদিকের মনোরম পরিবেশে। মুগ্ধ হয়ে যান লালনের নতুন আখড়া দেখে।

লালন গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে সিধে সংগ্রহ করে ফিরে আসে।

এসেই কাঙাল হরিনাথকে আখড়ার দাওয়ায় বসে থাকতে দেখে বলে ওঠে, ওহে কাঙাল, তুমি এমন কারবার কবে থেকে করছো হে। গৃহস্বামী নেই সেই ফাঁকে পরের ঘরে সেঁদিয়েছো।

লালন ঝোলাঝুলি, একতারা, খঞ্জনি নামিয়ে রাখে।

হরিনাথ বলেন, এ যে মজার খাসমহল বানিয়েছো। নিজে তো একবার বলতে পারলে না তোমার কাঙাল বন্ধুকে। না পেরে নিজেই দেখতে এলাম।

—ইচ্ছে ছিলো আগামী পূর্ণিমায় তোমার কাছে যাবো। কিন্তু তার আগেই তুমি এলে। লালন জড়িয়ে ধরে কাঙালের দুটি হাত। বলে, আজ আমার আখড়া ধন্য হলো তোমার পায়ের ধুলোয়।

—যাক। কাঙাল বলে, বলো কেমন আছো তুমি?

—আছি আর কই। লালন রহস্যচ্ছলে বলে, একটা পুতুল পেয়েছি, রঙিন পুতুল—তাই নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। কিন্তু এই বাউলের জীবনে কি পুতুলখেলা শোভা পায়।

—পায় বৈকি! হরিনাথ মৃদু হাসি মিশিয়ে বলেন, মনের মতন

পুতুল হলে খেলা যায় বৈকি। তারপর বলো—নতুন কি গান বাঁধলে ?

— গান আর বাঁধছি কই কাঙাল। সময় পাই তো মন পাই না। আবার মন আসে তো সময় স্থির হয়ে দাঁড়ায় না। তবু ওরই মধ্যে ভাব আর ভাষা দিয়ে একটু-আধটু লিখি। ঘরে আমার মন বসে না। তবু ঘর বেঁধেছি। জানি—এই ঘর নিয়ে কপালে আমার অনেক দুঃখ আছে কাঙাল। তাস খেলতে সাধ অথচ তুরুপ মারতে শিখিনি। তবুও অবাক কাণ্ড, খেলতে বসেছি হেরে মরতে হবে জেনেও।

—রঙের টেক্কা তো হাতেই আছে লালন সাঁই। দেখবে ওই এক টেক্কাতেই বাজীমাৎ। তা ছাড়া তোমার পথ তো পরিষ্কার, আর ভাবনা কি ?

কথার মধ্যে হরিনাথ উন্মনা হয়ে পড়েন।

কাঙালের এই ভাবান্তর লালনের দৃষ্টি এড়ায় না। জিজ্ঞাসা করে, কি ভাবছো ?

হরিনাথ বলেন, নিজের ভাবনা। আজকাল মাঝে মাঝে ভাবি। লালন—সেদিন আরশিতে নিজের মুখ দেখলাম। দেখে অবাক হলাম। ভাবলাম, দেহের ওপর দিয়ে সময়ের রথটা কেমন গড়গড়িয়ে যাচ্ছে। আজ নিজেকে চিনতে পারলাম, এমন একদিন আসবে যেদিন আরশির মধ্যে নিজের মুখটাও চিনতে পারবো না। তারপর সব চেনা জানার বাইরে চলে যাবো একদিন।

কথার মধ্যে কাঙাল হরিনাথ যেন আর এক জগতে হারিয়ে যান। লালনের এই মুহূর্তে মনে পড়ে সিরাজ সাঁই-এর কথা। সাঁইজীও শেষের দিকটা এমনি সুরে কথা বলতো। তবে কি কাঙালের জীবনেও শেষের দিন এগিয়ে আসছে।

হরিনাথ এবারে গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলেন, ভাবছি দিন কতক ঘুরে আসি। পারি তো ফিরবো। না হয় বৃন্দাবনের বাতাসে শেষ নিঃশ্বাস মিশিয়ে দেবো।

—কাঙাল !

লালন বিচলিত হয় হরিনাথের কথায়।

হরিনাথের মুখে এবারে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। বলেন, চলে যাবার ইচ্ছেটা রয়েছে, তাই তো এলাম তোমার কাছে। যাবার আগে তোমার নতুন গান শোনাবে না বাউল ?

লালনের কণ্ঠে সেদিন নতুন গান নতুন সুরে ঝংকৃত হয়

কাঙাল হরিনাথের মতো একদিন লালনও মনের দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখলো।

সত্যি, সময়ের রথটা দেহের ওপর দিয়ে গড়গড়িয়ে চলেছে। সেই কালের রথের চিহ্ন মুখের রেখায় স্পষ্ট।

চোখের সামনে দিয়ে শৈশব গেছে, কৈশোর গেছে, গেছে যৌবনের নানা রঙের দিনগুলি।

এরপর আরো দিন যাবে। নড়বড়ে হবে জীর্ণ দেহটা। তারপর জীর্ণ দেহটা একদিন বিকল হয়ে যাবে।

সাকিনা ভরা কলসি কাঁখে নিয়ে আসছিল। দূর থেকে সাকিনাকে দেখেই লালনের মনে এই প্রতিক্রিয়া।

সেদিনের সাকিনার সঙ্গে আজকের সাকিনার কতো তফাৎ। কতো বদলে গেছে সে। জীবনের ওপর দিয়ে কতো রঙ বদল হলো, অথচ হিসেব মিলিয়ে বোঝার জো নেই।

কাছে এলো সাকিনা। কলসি নামিয়ে রাখলো। তারপর তির্যক দৃষ্টিতে লালনের মুখের দিকে তাকালো, কি দেখছো অমন করে?

—তোমাকে আরশি করে নিজেকে দেখছি।

—আর কিছু নয় তো?

—না গো না। বলে লালন সুর ধরে, 'আমার পাড়ার কাছে আরশি নগর পড়শী বসত করে।'

বাইর থেকে কলরব ভেসে এলো। লালনের ভক্তজনেরা আসছে। শীতল, ভোলাই, পাঁচু—এ ছাড়া আরো কত নরনারী।

এরা প্রতিদিন অপরাহ্ণে লালনের আখড়ায় আসে। লালনের কাছে গানে তালিম নেয়, তত্ত্বকথা শোনে। আর সাকিনা হাসিমুখে সকলের পরিচর্যা করে।

—ওরে, সব মাছের পুনারা এয়েচে রে।

লালন ভক্তজনদের উদ্দেশ্যে 'মাছের পুনা' কথা ব্যবহার করে।

সাকিনা বোঝে একথার অর্থ। বলে, মাদুর চাটাই তো বিছানো আছে. বসুক না সব।

ভক্তজনেরা আখড়ার দোচালায় এসে আসর জমিয়ে বসে।

লালন আসরে যায়। নির্দিষ্ট চৌকিতে বসে। ভক্তদের মধ্যে শীতল দাস তার সব চেয়ে প্রিয়। বলে, কি রে শীতল—এরা তোকে দালালি দেয় নাকি রে? সব ছানাপুনাদের ঝেঁটিয়ে আনছিস বড়ো।

শীতল জানে তার গুরুর স্বভাব। বলে, এদের ঝেঁটিয়ে আনতে হয় না। এমনিতেই আসে।

—ও তাই নাকি রে! লালন কথার মধ্যে ফিরে চায় তার ঘরের দিকে। দাওয়ার কোণে খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাকিনা। ডেকে বলে, কই গো—একবার এদিকে এসো গো। পুনাদের সব জল বাতাসা দাও, ওরা সব তেষ্টা নিয়ে আসে।

সাকিনাও কথায় কম যায় না। বলে, ওদের তেষ্টা কি জল বাতাসায় মিটবে। দেখছো না—চাতক পাখির মতো সব চেয়ে আছে তোমার মুখের দিকে।

লালন উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে। ভক্তজনদের উদ্দেশ্য করে বলে, কি গো —তোমরা সব চাতক পাখি নাকি গো?

ভক্তরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারা জানে লালনের প্রতিটি কথার মধ্যে কোনো না কোনো অর্থ লুকিয়ে থাকে।

লালনের মুখে তখনো সেই হাসিটি। বলে, গুরুগিরি আর ভালো লাগছে না রে। এবারে ভাবছি কি জানিস তো—আমিও চাতক পাখি হয়ে যাই। মনের তেষ্টাটা বাড়িয়ে নিই—তারপর দেখি না মেঘের সন্ধান করে। কোথাও যদি তেষ্টার জল পাই।

বলে চুপ করে যায় লালন। ভক্তজনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর আবার সেই কথার খেই ধরে বলে, অনেককাল তো খুঁটি বাঁধা হয়ে একজায়গায় ঘুরপাক খেলাম—এবারে দেখি না আবার বাইরের দুনিয়াটা। —কি গো পুনারা, তোমরা কি বলো?

শীতল বলে, কোথায় যাবে তুমি?

লালন বলে, জানি না।

শীতল ছাড়বার পাত্র নয়। বলে, তোমার কথা তুমি জানো না সে আবার কি।

লালন বলে, আমিটা আর আমার মধ্যে নেই।

—তবে!

লালন চোখ ইশারায় দেখিয়ে দেয় সাকিনাকে। বলে, জলে ডুবলো পদ্ম তোলার ছলে। ডুবিয়ে দিলে আমার আমিটাকে। যে ডুবলো তাকে যদিও বা তুললাম, কিন্তু আমার আমিটাকে অতলে রেখে এলাম।

লালনের কথায় সাকিনার মুখ চোখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

লালন বলে তাই ভাবছি, এবারে যেখানেই যাই না কেন, ডুব সাঁতার দিয়ে যাবো। নতুন করে আর তো ডুবতে হবে না।

সবাই চুপচাপ। লালনের হেঁয়ালির অর্থ কারো কাছে স্পষ্ট নয়।

লালন তখনো জলচৌকির ওপর বসে সামনে মুখ টিপে হাসছে।

—ওরে আমার একতারাটা দেরে। আচমকা লালন চিৎকার করে ওঠে, ব্যাটাদের সব জাগিয়ে দেই।

শীতল একতারা তুলে দেয় লালনের হাতে।

একতারার সরু তারে ঝংকার তুলে লালন বলে, এটা কি আজব যন্ত্র দেখেছিস? এত বড়ো যন্ত্র—কিন্তু বাজে এই তারটা। কিন্তু নিজে বাজে না। বাজাতে হয়। আমাদের দেহটাও তেমনি একটা যন্ত্র। একতারার তারের মতো সেখানেও একটা সুক্ষ্ম তার রয়েছে। তার নাম আত্মা। চৈতন্যরূপী আত্মা। আর সেই আত্মাই তো আমি। আবার মজার কথা কি জানিস, আমাকেই সেই আত্মারূপী তারটাকে বাজাতে হয়। এক আমি আর এক আমিকে বাজায়। মানব সত্তা, আর ঈশ্বর সত্তা—সুরের মধ্যে এক হয়ে যায়। সেখানে ভিন্ন কিছু নেই—সব একাকার। সুরের মধ্যে চাতক মনটা হয় ঈশ্বরমুখী।

কথার শেষে লালনের কণ্ঠে জাগে সুরের গুঞ্জন। একতারা বাজিয়ে গান ধরে, 'চাতক স্বভাব না হলে, অমৃত মেঘের বারি কথায় কি মেলে।'

গানের মধ্যে লালনের কথার অর্থ খুঁজে পেয়েছে ভক্তজনেরা। কথায় যা দুর্বোধ্য, গানের ভাষায় তা স্পষ্ট।

গান শেষ হলো। ভাবকাতর দৃষ্টিতে লালন তাকালো ভক্তজনের দিকে। তারপর দু' চোখ বন্ধ করে আবার আপন ভাব-সমুদ্রে ডুব দিল।

সে রাতে আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। আবহাওয়াটা ছিল গুমোট।

হঠাৎ ঝড় উঠলো। ঝড়ের সঙ্গে মুষলধারায় নামলো বৃষ্টি।

আখড়ার ছোট ঘরটিতে পাশাপাশি দুটি শয্যায় ঘুমিয়ে আছে লালন আর সাকিনা। দুজনেই গভীর ঘুমে অচেতন।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে লালন। দুঃস্বপ্ন। দেখছে—পদ্মাবতী যেন ছায়াদেহে লালনের মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। কোনো কথা নেই মায়ের মুখে। ছায়ামূর্তি যেন মিশে রয়েছে শূন্যের সঙ্গে।

লালন সেই ছায়ার মধ্যে মায়ের স্পষ্ট অবয়ব খুঁজে পেতে চাইলো।

কিন্তু স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠার আগেই মায়ের ছায়া দেহটা শূন্যের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

ঘুম ভেঙে যায় লালনের। ঘুম ভাঙা মুহূর্তে আর্তকণ্ঠে 'মা—মা' বলে ডেকে ওঠে।

জেগে ওঠে সাকিনা। জিজ্ঞাসা করে, কি হলো?

লালন গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, জানো সাকিনা, মা আমার চলে গেলেন।

—কি বলছো তুমি!

—যাবার আগে মা আমাকে দেখা দিয়ে গেলেন। লালনের কণ্ঠে দুঃখের সুর জড়ানো। বলে, মা আমার জনমদুখিনী। আমি তাকে কোনদিন সুখী করতে পারিনি সাকিনা।

লালনের চোখ দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ে। সাকিনা এই মুহূর্তে আর কথা বলে বাউলের দুঃখটাকে বাড়াতে চায় না।

লালনের দুঃখ সাকিনাকেও স্পর্শ করে।

বাইরে দারুণ দুর্যোগ। ঝড় বৃষ্টি সমানে চলছে। মাঝেমাঝে ক্ষণ-বিদ্যুতের আলো কুটির জানালা দিয়ে ভিতরের অন্ধকারকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে।

লালন এসে দাঁড়ায় খুপরি জানালার ধারে। চেয়ে থাকে সজল চোখে বাইরের ঘন অন্ধকারের দিকে।

সাকিনা এসে দাঁড়ায় লালনের পাশে। সাকিনার তপ্ত নিঃশ্বাসে লালনের

চমক ভাঙে। বলে, সাকিনা—এমনি করে এক-একটা আঘাত আসে, আর সেই আঘাতেই বোধহয় মনের ভিতরের মনটাকে নাড়া দিয়ে যায়।

সাকিনা নীরব।

লালন ফিরে তাকায় সাকিনার মুখের দিকে। বলে, কি ছিলাম, আর কি হলাম। বাউল কোথায় ছুটে বেড়াবে দেশে বিদেশে, পথের ধূলো গায়ে মাখবে—তা নয়, সে স্থির হয়ে বসে রইলো সাকিনা নামে রমণীর আঁচলের আড়ালে। আর নয়, এবারে তাকে আঁচল ছাড়তেই হবে।

সাকিনা বলে, ওগো—ও কথা কেন?

লালন বলে তোমাকে দোষ দেবো না সাকিনা—দোষ আমার ভাগ্যের।

সাকিনা বলে, ও সব কথা এখন থাক।

—থাকলে তো চলবে না। লালন বলে, যে কথাটা মনে এসেছে সে সে কথাটা তো তোমাকে বলতেই হবে।

—কি কথা। সাকিনা উতলাকণ্ঠে বলে, যে কথাটা বলতে তোমার এত দ্বিধা।

—আমি চলে যাবো সাকিনা।

—চলে যাবে! কোথায়?

—জানি না, পথ যেদিকে টানে সেদিকেই চলবো। তবে যাবার আগে জন্মভূমি না দেখে যাবো না।

—কিন্তু আমি কি করবো?

—তুমি! তুমি এখানেই থাকবে ঘুড়ির লাটাই ধরে। সুতো ধরে টানলেই ফিরে আসবো।

—কিন্তু!

—ভয় নেই। কড়া মান্‌জা দেওয়া সুতো, ছিঁড়বে না। সাকিনাকে দু'হাতে কাছে টানে লালন। বলে, আমার মধ্যে তুমি কি পেয়েছো জানি না, তবে তোমার মধ্যে আমি পেয়েছি ঘর। যে ঘর তুমি দিয়েছো, তুমিই তো তার ঘরণী। তোমাকে সেই ঘর আগলে থাকতে হবে।

—কিন্তু আমি যে একা।

—এবারে তুমি হাসালে সাকিনা! কে বলে তুমি একা!

কিছু সময় চুপ করে থেকে সাকিনা কি যেন ভাবে। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, তোমার ইচ্ছেয় আমি বাধা হবো না বাউল। তোমার মন যা চায়,

তাই তুমি করো। তবে একটা কথা মনে রেখো, সাকিনা তোমার অপেক্ষাতেই থাকবে।

লালন মুখে যাই বলুক, মনে বোঝে, এই মুহূর্তে সাকিনার দুঃখটা কেন এবং কোথায়। তাই তো অন্তরঙ্গ সুরে বলে, তোমার ইচ্ছে আমার ইচ্ছে তো আলাদা নয় সাকিনা। যেদিন পদ্ম তোলার ছলে জলে ডুবেছিলে, সেদিন তো সব একাকার হয়ে গেছে।

বলে লালন ফিরে চায় সাকিনার মুখের দিকে। মাথা নিচু করে আঁচলে চোখ মোছে সাকিনা।

রাত শেষ হয়ে আসছে।

এখনো ঘুমিয়ে আছে সাকিনা। কিন্তু ঘুম নেই লালনের চোখে। নীরবে দু চোখ খোলা রেখে শুয়ে আছে চাটাই-এর ওপর।

একসময় উঠে বসে লালন। নিদ্রিত সাকিনাকে লক্ষ্য করে। কতো নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে সে।

ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের ম্লান আলোতেও কতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে সাকিনার অমলিন মুখখানি।

লালন অপলকদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সাকিনার মুখের দিকে।

এবারে উঠে বসে লালন। নিজের ঝোলাঝুলি কাঁধে তুলে নেয়। হাতে নেয় একতারা।

কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়েও ফিরে আসে। ভাবে, না, এমন করে পালিয়ে যাবে না সে।

আবার সাকিনার শয্যাপ্রান্তে আসে লালন। নিদ্রিত সাকিনার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

কতো নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে সাকিনা। ঘুমের মধ্যেও তার চোখে-মুখে কী গভীর প্রশান্তি।

লালনের নিঃশ্বাসের স্পর্শে ঘুম ভেঙে যায় সাকিনার। যেন স্বপ্ন দেখেছে সাকিনা। লালনকে চোখের সামনে দেখেও মনে হয় স্বপ্ন দেখছে সে।

এবারে উঠে বসে সাকিনা। বিস্ময় জড়ানো কণ্ঠে বলে, তুমি!

লালন কথা বলে না। সাকিনা লক্ষ্য করে লালনকে। বলে, আমাকে

ডাকোনি কেন? তুকি কি করে মনে করলে আমি তোমার পায়ে বেড়ি হয়ে জড়াবো। তুমি বাউল—ঘর বার তোমার কাছে এক হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তো ঘর-বার বুঝি না। আমি জানি তোমাকে। আমার ধর্ম-কর্ম সবই তোমাকে নিয়ে।

লালন বলে, সাকিনা—আমাকে ভুল বুঝো না। রাতে মা'কে স্বপ্ন দেখার পর থেকে মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাই মনটাকে শান্ত করতে দিনকতক ঘুরে আসা।

সাকিনা বলে, বেশ তো—যাও না।

—সাকিনা।

সাকিনার নাম ধরে ডেকে লালন চুপ করে যায়। কিছু বলবে মনে করেও বলতে পারে না। শুধু অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সাকিনার মুখের দিকে।

সাকিনা কি বোঝে সেই জানে। বলে, আজ তোমাকে নিজের হাতে সাজাবো বাউল।

—সাজবার কি বয়েস আছে সাকিনা?

—জানি না, জানতে চাই না। সাকিনা বলে, তোমার কোনো কথা শুনবো না। বোসো চুপ করে, আমি আসছি।

লালনকে মনের মতো করে সাজায় সাকিনা। চূড়া করে বেঁধে দেওয়া চুলে ফুলের মালা, কপালে চন্দনের টিপ, গলায় নানা রঙের পুঁতির মালা। পরিপাটি করে পরালো আলখাল্লা।

সাজানো শেষ হলো। তারপর কাঁধে দিলে নক্সী কাঁথার ঝোলা, হাতে একতারা আর খঞ্জনী।

লালন মুখ টিপে হাসে। উঠে দাঁড়ায়। বলে, এবারে আমি যাই সাকিনা।

সাকিনা বলে, একটা গান শোনাবে না।

—গান! লালন মাথা নাড়ে। বলে, আজ আমি নয়—তুমি।

—না, না। সাকিনা বলে, আমি গান জানি না।

—মিথ্যে কথা। লালন বলে, আমি জানি তুমি গাইতে জানো। আমি জানি, আমার গান তোমার কণ্ঠে প্রাণ প্রায়।

বলে লালন নিজেই সুর ধরে,

'কুলের বৌ হয়ে মন আর কতদিন থাকবি ঘরে ?
ঘোমটা খুলে চলনারে যাই হাট-বাজারে।'

কখন যেন সাকিনাও কণ্ঠ মেলায় লালনের কণ্ঠে। দু'জনের কণ্ঠস্বর এক হয়ে মিশে যায়।

আখড়ার নিভৃত পরিবেশ মুখর হয়ে ওঠে দ্বৈতকণ্ঠের গানের সুরে।

নদীতীরের পথ ধরে চলে লালন। কণ্ঠে তার গানের সুর। ক্ষ্যাপা বাউল একতারা বাজিয়ে চলেছে যাযাবর-ছন্দে। আজ এখানে, কাল সেখানে। পরশু আর এক নতুন ঠিকানায়।

প্রথমে এলো জন্মভূমিতে। ভিটেবাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো!

শূন্য ভিটা। জীর্ণ কুটির ধ্বসে গেছে। শুধু দাঁড়িয়ে আছে মাটির দেয়ালের অংশ।

জন্মভূমির মাটি মাথায় তুলে নিলে লালন। দাঁড়িয়ে রইলো শূন্য মনে। দু ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়লো। তারপর শূন্য মনে আবার পথ চলতে আরম্ভ করলো।

একবার মনে হয়েছিল একটা রাত অন্তত জন্মভূমিতে কাটায়। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। সামনের পথ তাকে ডাকছে।

গ্রামের পথ পেরিয়ে যখন গৌরী নদীর খেয়াঘাটের কাছে এলো, তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে।

খেয়া পেরিয়ে আবার শুরু হলো তার পথ চলা। চেনা পথ। এই পথ ধরে কতোবার যাওয়া-আসা করেছে লালন।

হোক চেনা পথ—তবু আজ লালনের কাছে এ পথ কেমন যেন অচেনা মনে হয়।

মাঝ রাতে ক্লান্ত লালন আশ্রয় নিলে একটি আটচালায়। রাতটা কোনো মতে কাটিয়ে আবার সূর্য ওঠার মুহূর্তে সুরু করে পথচলা।

এবারের পথ চলেছে দুরন্ত পদ্মার দিকে।

পদ্মাপারে গ্রাম। নাম শিলাইদহ। শিলাইদহের কাছে পৌঁছলো যখন, তখন অপরাহ্নের সূর্য পদ্মার ওপারে।

সারাদিন পথশ্রমে ক্লান্ত লালন। চলতি পথে ঠাকুরবাবুদের কাছারি বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়ালো।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এসেছেন। বসে আছেন কাছারি বাড়ির প্রাঙ্গণে। তত্ত্বকথা আলোচনা করছেন কয়েকজন বিচক্ষণ মানুষের সঙ্গে।

লালন এসে দাঁড়ায় কাছারি বাড়ির প্রাঙ্গণে। দূর থেকেই মাথা নিচু করে নমস্কার জানায় মহর্ষিকে।

মহর্ষি লক্ষ্য করেন লালনকে। ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলেন। বারান্দার প্রান্তে আসন গ্রহণ করে লালন।

মহর্ষি তত্ত্বকথা আলোচনা করছেন। তাঁর বক্তব্য—ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার এবং নিরাসক্ত। রূপ থেকে অরূপে তিনি বিরাজমান। এই আমাতেও যেমন তাঁর প্রকাশ, তাঁরই প্রকাশ অনু-পরমানুতে। তাঁরই প্রকাশ অসীম অনন্তে।

লালন মুগ্ধ হয়ে শোনে মহর্ষির মুখের তত্ত্বকথা।

এক সময় মহর্ষির কথা শেষ হলে লালন বলে, ঠাকুরবাবুমশায়, অধীন কি তার ভাবনার কথা বলতে পারে?

মহর্ষি সানন্দে সম্মতি দিলেন।

লালন বলে, মানুষের অতশত ভাববার দরকার কি। মানুষ যদি ছোট কথায় ভাবে, এই আমার মধ্যে যাঁর বাস, তিনিই সর্বত্র বিরাজ করছেন, তাহলে তো সব ভাবনা শেষ হয়ে যায়। মোদ্দা কথা তো এই—তিনিই আমি, আমিই তিনি।

মহর্ষি বলেন, এই ছোট কথাটাই তো শেষ কথা বাউল। যাক—এবারে তোমার একটা গান শোনাও লালন।

—গান! লালন বলে, কি গান গাইবো বাবুমশায়।

—যে গান শোনাতে তোমার ইচ্ছে হয়। মহর্ষি বলেন, গাইবে তুমি, শুনবো আমরা। এখানে তোমার ইচ্ছেটাই আসল।

লালন উঠে দাঁড়ায়। দু চোখ বন্ধ করে একতারাটা বাজাতে আরম্ভ করে। তারপর ফিরে তাকায় মহর্ষির মুখের দিকে। বলে, সুরের খেইটা ধরতে পারছি না বাবুমশায়। মাঝে মাঝে কি যে হয় বলতে পারিনে।

বড় করুণ শোনায় লালনের কথা। মহর্ষি বলেন, তুমি তো সুরের যাদুকর!

—আমি নই বাবুমশায়। লালন বলে, আমার মধ্যে যে আমিটার বাস—সে-ই তো গায়।

বলে আবার দু চোখ বন্ধ করে লালন। যেন মনের মধ্যে ডুব দিয়ে সেই আমিটারে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত কাটে। তারপর হঠাৎ কী যেন হয় লালনের, একতারা আর খঞ্জনী বাজাতে আরম্ভ করে। খানিক সময় বিভোর হয়ে নাচে, তারপর শুরু করে গান—

'চেয়ে দেখনারে মন দিব্য নজরে,
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে।'

গান শেষ হয়। লালনের গান শুনে মহর্ষি ভাবাবেশে বিভোর হয়ে পড়েন। তাঁর দু চোখ বেয়ে ভাব-অশ্রু ঝরে পড়ে।

আরো যাঁরা কাছারি বাড়ির প্রাঙ্গণে উপস্থিত, তাঁরাও এই বিচিত্র বাউল লালনের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন।

মহর্ষি এবারে লালনকে জিজ্ঞাসা করেন, আবার কবে আসবে এ পথে?

লালন বলে, জানি না বাবু। বেরিয়েছি পথে। দেশ-দেশান্তর বেড়িয়ে আসবো। খুঁটোয় বাঁধা মনটাকে মাঝে মাঝে উদোম করে দেই। নইলে যেন স্বস্তি পাইনে। আমার আসা-যাওয়ার কি ঠিক আছে বাবুমশায়?

—কিন্তু এখন কোথায় যাবে? সন্ধ্যে তো হয়ে এলো।

—সন্ধ্যে হয়ে এলো! লালনের মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাসি। বলে, হোক না সন্ধ্যে, রাত তো হয়নি। বাবুমশায়, এবারে আমি আসি।

মহর্ষি বলেন, একটু বোসো।

লালন বারান্দার একান্তে গিয়ে বসে।

মহর্ষি নিজের হাতে নতুন কাপড় এবং কিছু অর্থ দান করলেন লালনকে।

লালন হাত পেতে মাথায় তুলে নিলে মহর্ষির দান।

মহর্ষি বলেন, এরপর আবার যদি কখনো এখানে আসি, তাহলে আমাকে গান শুনিয়ে যেতে ভুলো না।

—না বাবুমশায়।

লালন মাথা হেঁট করে প্রণাম জানায় মহর্ষিকে। তারপর নীরবে কাছারি বাড়ি ত্যাগ করে আবার পথে এসে থমকে দাঁড়ায়।

এবারে পথ চলে গেছে পূব থেকে পশ্চিমে। পশ্চিমেই চলতে আরম্ভ করে লালন।

পথ চলে লালন। আজ এখানে, কাল সেখানে। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো নৌকোয়—কতো গ্রাম, জনপদ পেরিয়ে লালন এসে পৌঁছলো বাঙলার রাঢ় অঞ্চলে।

রাঙামাটির দেশ বীরভূম। আউল-বাউলের দেশ। গান এখানকার মাটিতে, গান এখানকার আকাশে-বাতাসে। এ-দেশের মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে কীর্তন-বাউলের সুর।

পথেই লালনের সঙ্গে দেখা হলো একদল বাউল-বৈষ্ণবের।

ভিনদেশী বাউলকে দেখে তারা কৌতূহলী হলো। জানতে চাইলো কোথায় ঘর, কোথায় নিবাস। জানতে চাইলো, কি জাত।

লালন মৃদু হেসে বলে, ঘর একটা আছে অবশ্য, তবে সেটা নামেই ঘর। আসলে সেটা খেলাঘর ছাড়া আর কিছু না। আর জাতের কথা বলছো! বাউলের আবার জাত-ধর্ম কি? সে তো সবকিছুর বাইরে।

বলেই একতারা বাজিয়ে সুর করে বলে,

'সব লোকে কয়, লালন কি জাত সংসারে,
(লালন বলে) জাতির কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।'

বাউল-বৈষ্ণবের দল লজ্জিত হয় লালনের কথায়! তাদের লজ্জা নিজেই কাটিয়ে দেয় লালন। বলে, বড়ো ভালো লাগলো তোমাদের। তা দল বেঁধে কোথায় যাচ্ছো তোমরা?

—কেঁদুলিতে। জয়দেবের মেলায়? তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

—যাবো বৈকি! লালন আত্মগত সুরে বলে, নিশ্চয়ই যাবো—আমার তীর্থ দেখবো, গায়ে মাখবো তীর্থের ধুলো, স্নান করবো অজয়ের জলে। তারপর আর কি, ব্যস্—দেহ মনের যতো ময়লা ধুয়েমুছে পথ চলবো।

পথিক বাউলেরা অবাক হয়ে শোনে লালনের কথা।

লালন বলে, অমন করে কি দেখছো আমার মুখের দিকে চেয়ে। পায়ের

দিকে নজর রেখে চলো—নইলে হোঁচট খাবে। ফকির বাউলের পথ বড়ো কঠিন।

নতুন উদ্যমে পথ চলতে আরম্ভ করে বাউল বৈষ্ণবের দল। লালনকে পেয়ে ওরা সবাই যেন মেতে উঠেছে।

চলতি পথে আরো নতুন নতুন দলের সঙ্গে দেখা হলো। কতো দেশের কতো দল। সবাই চলেছে কেঁদুলির জয়দেবের মেলায়।

অজয় নদের তীরে জয়দেবের স্মৃতি-বিজড়িত কেন্দুবিল্ব। মকর সংক্রান্তির সময় প্রতি বছরেই এখানে মেলা বসে। বাউলের মেলা। দেশ-দেশান্তর থেকে হাজার হাজার ফকির, বাউল, বৈষ্ণব এখানে অজয়ের তীরে মিলিত হয়। মেলা নয়—যেন মিলনের মহোৎসব। কদিনের জন্যে মুখর হয়ে ওঠে কেন্দু-বিল্বের নিভৃত পরিবেশ।

শুধু ফকির, বাউল নয়—গৃহী নর-নারীও আসে এই মেলায়। জয়দেবের মেলা সকল মানুষের মিলন তীর্থ।

জয়দেবে পৌঁছেই লালন মন্দিরে যায় দেবদর্শন করতে। দূর থেকে প্রণাম জানায় দেবতাকে। প্রণাম জানাতে কেমন যেন ভাবাবেশে বিভোর হয়। মন্দির অঙ্গনে দাঁড়িয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে লালন। পরক্ষণে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে ধুলোর ওপর।

যারা লালনের সঙ্গে এসেছে, তাদেরি একজন লালনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। বলে, কি হলো বাউল! অমন করছো কেন?

লালন তখন ভাব সমাধিতে বিলীন হয়ে আছে।

আশে-পাশে যারা ছিল, তারা লালনকে ধরাধরি করে তুলে এনে বসায় অজয়ের বালিয়াড়ির ওপর। তখনো ভাবের সমুদ্রে তলিয়ে আছে লালন।

কিছুক্ষণ বাদে লালন চোখ মেলে চায়। বারকয়েক বিলম্বিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলতে থাকে, জানিস—মাঝে মাঝে কী যে হয় আমার, আমিই জানি না। দেহ কুঠুরির সব জানালা দরজাগুলো বাইরে থেকে কে যেন বন্ধ করে দেয়। একটা ঘুলঘুলিও খুলে রাখে না। মধ্যেকার আমিটা ছটফট করে খাঁচায় বন্দী পাখির মতো। কিন্তু আমিটা যে মুহূর্তে তার স্বরূপ চিনে

নেয়-—তখন আর কি, তার ছটফটানি বন্ধ হয়ে যায়। স্থির হয়ে বসে থাকে আমার সঙ্গে একাকার হয়ে।

এরপরেই লালন ভাবাবেশে বিভোর হয়ে গান গাইতে আরম্ভ করে। তার গানের সুরে আকৃষ্ট হয়ে বাউল-বৈষ্ণবেরা ভিড় করে। হতবাক বিস্ময়ে লালনকে লক্ষ্য করে সবাই। এ যেন এক নতুন ভাবের বাউল।

একটি রাত জয়দেবের মেলাতে কাটালো লালন। তারপর আবার সুরু হলো পথ চলা।

বাংলার রাঢ় অঞ্চল পরিক্রমা শেষ করে লালন এলো নবদ্বীপধামে।

নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে অজস্র নর-নারীর ভিড়।

লালন পারে নামতেই অনেকেরই কৌতূহলী দৃষ্টি পড়লো। পরনে বাউলের পোশাক। হাতে একতারা আর খঞ্জনী। অথচ গলায় মুসলমান ফকিরের মতো নানা জাতের পুঁতির মালা।

স্নানরত একজন জিজ্ঞাসা করে, কর্তার আসা হচ্ছে কোত্থেকে। নিবাস কোথায়?

লালন হেসে বলে, ভবঘুরে বাউলের কি আসা-যাওয়ার ঠিক-ঠিকানা থাকে গো?

—কর্তার নাম কি?

—বাউলের আবার নাম কি! বাপ-মা ডাকতো লালন বলে।

—জাত কি?

—জাত? এবারে লালন না হেসে পারলো না।—মানুষ জাতের নাম শুনেছো? আমি সেই জাতেরই একজন। নবদ্বীপের মাটিতেও জাতের কথা! অবাক হলাম আজ।

আর দাঁড়ায় না লালন। তরতরিয়ে উঠে যায় ঘাটের সিঁড়ি-পথ ধরে।

নবদ্বীপের পথের ধুলো মাথায় তুলে নেয় লালন। এই পথের ধুলোয় মিশে আছে প্রেমিক-পুরুষ শ্রীচৈতন্যের চরণ-স্পর্শ।

কীর্তনের সুর কানে আসে। সোনার গৌরাঙ্গের মন্দিরে কীর্তন হচ্ছে।

কীর্তনের সুর অনুসরণ করে লালন সেই দিকেই ছুটে চলে।

গৌরাঙ্গ মন্দিরের চত্বরে নর-নারীর ভিড়। কীর্তনীয়াকে ঘিরে সবাই তন্ময় হয়ে আছে কীর্তনের রসে।

লালন সোপান বেয়ে ওপরে ওঠে। প্রথমেই দূর থেকে গৌরাঙ্গের স্বর্ণ-মূর্তিকে প্রণাম করে।

প্রণাম করতেই কী যে হয় লালনের, দুচোখ দিয়ে তার দরদর ধারায় গড়িয়ে পড়ে ভক্তি-অশ্রু।

তখনো কীর্তন চলছে। কীর্তনীয়া আজু গোঁসাই—যাঁর অমৃত-ঝরা কণ্ঠে বিদ্যাপতির পদাবলী শুনে লালন অবাক হয়ে যায়। এত সুর, এত ভাব! কীর্তনের মধ্যেই ভাবাবেশে উতলা হয় লালন। কী যে হয় তার—আচমকা মন্দিরের সোপানের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ শুরু হয়। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে ওঠে, আরে এ যে ম্লেচ্ছ ফকির।

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে আরো মানুষের কানে যায়। কয়েকজন ছুটে এসে লালনকে সরিয়ে দিতে চায়, কিন্তু কাকে সরাবে। লালনের অর্ধ-অচেতন দেহটা কেমন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

—মৃগী নেই তো রে! কে একজন বলে ওঠে ভিড়ের ভিতর থেকে।

—না রে না, ব্যাটা জাতভণ্ড। টিপ্পনী শোনা যায় ভিড়ের মধ্যে থেকে।

—ম্লেচ্ছের আবার কীর্তন শুনে ভিরমি খাওয়া—বাপের কালে শুনিনি বাপু।

নানা জনের নানা কথার মধ্যে কীর্তনীয়া আজু গোঁসাই এগিয়ে আসেন। লালনকে এক নজরে দেখেই অবাক হয়ে যান। বিচিত্র এক হাসি ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। দুহাতে লালনকে তুলে ধরতে যান।

একজন বাধা দেয়, গোঁসাইজী—লোকটা মনে হয় ম্লেচ্ছ। দেখছেন না—

আজু গোঁসাই-এর মুখে তেমনি হাসি জড়িয়ে থাকে। বলেন, কাকে কি বলছো তোমরা—দেখেও মানুষ চিনতে পারো না।

—কিন্তু গোঁসাইজী!

—তোমাদের মনে নেই ঠাকুর হরিদাসের কথা। যে ভক্ত, তার কাছে ভক্তিটাই তো ধর্ম।

এইবারে আজু গোঁসাই দু'হাত দিয়ে স্পর্শ করে লালনকে। স্পর্শ পেয়েই লালন সম্বিৎ ফিরে পায়। একবার দু'চোখ মেলে দেখে নেয় গোঁসাইজীকে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসে।

দু'জনের কারো মুখে কথা নেই। এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে মনের ভাব বিনিময় করে। কথা না বলেও তো অনেক কথা বলা যায়।

আজু গোঁসাই-এর দুটি হাত ধরে লালন উঠে দাঁড়ায়। গোঁসাইজী নিবিড় আলিঙ্গনে লালনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন।

সবাই অবাক হয়ে দেখে ভাবরাজ্যের দুই মানুষকে।

নবদ্বীপধাম ত্যাগ করে লালন গঙ্গাতীরের পথ ধরে চলে। অনির্দিষ্ট পথে চলতে চলতে একদিন কলকাতায় এসে পৌঁছোয়।

আজব শহর কলকাতা। লালন না জানে পথ-ঘাট, না চেনে শহরের আদব-কায়দা। তারপর কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে কিছুই বুঝতে পারে না।

শহরের মানুষগুলো যেন মেকি। এতো মানুষ, কিন্তু মানুষ দেখতে পায় না লালন।

কালীঘাটের কথা শুনেছে লালন। চোখে দেখেনি। আদিগঙ্গা ধরে একদিন কালীঘাটে এসে পৌঁছয় সে।

বাইরে থেকে দেখলো মন্দির। ভিতরে গেল না। মন্দিরের দরজা যে ওর জন্যে নয়।

মন্দিরের চূড়া লক্ষ্য করলো লালন। বাইরে দাঁড়িয়ে কতটুকু বা দেখা যায়। তারপর ফিরে চললো আপন পথে।

রাত হয়েছে তখন। এতো রাতে কোথায় যাবে সে। ভাবলো, গঙ্গার ধারে কতকগুলো চালা আছে। তারই একটাতে আশ্রয় নেবে সে।

তবুও রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবলো খানিক সময়। তারপর আবার চলতে আরম্ভ করলো।

পথের ধারেই মস্ত বড় অট্টালিকা। গাড়িবারান্দাও রয়েছে। এই তো

বেশ সুন্দর আশ্রয়। ঝোলাঝুলি নামিয়ে রাখলো বারান্দার কোণে। ওখানেই বসলো। ঝুলিতে চিঁড়ে-গুড় ছিল—খেতে আরম্ভ করলো বারান্দার কোণে বসে।

পথশ্রমে ক্লান্ত লালন শুয়ে পড়লো গাড়ি বারান্দার কোণে।

সবে ঘুমঘুম তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় শুনতে পেল, কে যেন তাকে ডাকছে।

লালন উঠে বসে। দেখে, চার-পাঁচ জন লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে।

—কী গো বাবু মশায়েরা, ডাকলে কেন?

একজন জড়িতকণ্ঠে বলে, জানোনা—এটা আমাদের মৌরশি-পাট্টা করা জায়গা। এখানে আমরা রাতভোর পঞ্চরঙের পুজো করি।

—পঞ্চরঙ! লালন বিস্মিত হয়! জানতে চায়, পঞ্চরঙ আবার কোন্ দেবতা।

—ওরে এ বেটা পঞ্চরঙের কথা জানে না। বলে একটি লোক বিকৃত স্বরে হেসে ওঠে।

লালন বলে, হাসছো কেন বাবুমশায়!

লোকটি এবারে আরো সুর চড়িয়ে হেসে ওঠে। ওরই মধ্যে কে একজন লোক তুলে নেয় একতারাটা। বাজাতে আরম্ভ করে।

—ও কি করছো বাবুমশায়?

—দেখি কেমন বাজে।

—না, না—ওটা যে আমার প্রাণের জিনিস, ওতে যে আমার সাঁইজীর—

—আরে ছোঃ, একজন জড়িতকণ্ঠে বলে ওঠে, ব্যাটা যে বেজাত।

লালন নিজেকে অসহায় বোধ করে। কি বলবে ভেবে পায় না। মানুষ-গুলো নেশায় উন্মাদ। ওদের কিছু বলতে যাওয়া মিছে।

—শোন। একজন টলতে টলতে এগিয়ে আসে। বলে, এক কাজ করলে মন্দ হয় না। বেটার মাথা কামিয়ে গঙ্গায় চুবিয়ে আনা যাক।

এরপব লোকগুলো জঘন্য ভাষা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে।

একজন তো ইতিমধ্যে লালনের গলার মালা ধরে টানাটানি আরম্ভ করে দিয়েছে।

ঠিক এই মুহূর্তে একটি ফিটন গাড়ি এসে দাঁড়ায়।

—এই রে, কে একজন চাপা গলায় বলে, নিধুবাবু।

অন্যের সঙ্গে লালনেরও দৃষ্টি পড়ে ফিটনের দিকে

টপ্পাবাজ নিধুবাবু প্রায়ই রাত্রে এ-পাড়ায় আসেন। আজও এসেছেন।

নিধুবাবুর পরনে ফরাসডাঙ্গার ধুতি, গায়ে কামিজ আর গলায় চিকনের কাজ করা ওড়না। পায়ে জরিদার নাগরা। মাথায় বাবরি চুলে মাঝ বরাবর সিঁথি কাটা। সব মিলিয়ে একেবারে ফুলবাবুটি।

ফিটন থেকে নেমে এসেছেন নিধুবাবু। ধুতির কোঁচাটি লুটিয়ে পড়েছে মাটির ওপর।

নিধুবাবুকে দেখে যে-যার পালাতে পথ পায় না। লালন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে এতোক্ষণে।

এবারে নিধুবাবু এগিয়ে আসেন লালনের কাছে। লালনের আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করে কিছু বলতে চান। কিন্তু তাঁকে বলার অবসর দেয় না লালন। নিজেই বলে, বাবুমশায়—শুধু এই রাতটা কাটাবো। বলতে পারেন কোথায় শান্তিতে রাতটা কাটাতে পারি ?

—এসো আমার সঙ্গে।

লালনকে সঙ্গে নিয়ে নিধুবাবু ফিটনে গিয়ে ওঠেন।

রাতের রাজপথ ধরে ফিটন চলে বাইজী পল্লীর দিকে।

কালীঘাটের কাছেই বাইজী পল্লী।

শহর ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু বাইজী পল্লী জেগে আছে।

ঘরে ঘরে সুরের আলাপ আর ঘুঙুরের বোল। কোথাও বেসুরো কণ্ঠে রাগিণী আলাপ, কোথাও বেতালা গান। কোথাও পানোন্মত্ত হাসি, উন্মত্ত চিৎকার। কোথাও সংযত-সঙ্গীতের ভেসে আসা স্বর। কোথাও রাতের নাগরের অপেক্ষায় দরজার প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোনো রূপসী রমণী।

লালন অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে ফিটনের জানালা দিয়ে। নিধুবাবু মুখ টিপে হাসেন। লালন ফিরে চায় নিধুবাবুর দিকে।

নিধুবাবু বলেন, ভয় নেই। আমি তো সঙ্গে আছি।

নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে ফিটন দাঁড়ালো। নিধুবাবু নামলেন। লালনও নেমে এলো।

পথে নেমেই লালন লক্ষ্য করলো, আশপাশের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে রূপসীরা।

নিধুবাবু জিজ্ঞাস, করেন, কী দেখছো বৈরাগী ?

লালন বলে, এ যে রূপের হাট বাবুমশায়। এ কোথায় নিয়ে এলেন ?

নিধুবাবু হেসে বলেন, এসোই না। বাউণ্ডুলে মানুষের অতো দ্বিধা কেন ?

লালন নীরবে নিধুবাবুকে অনুসরণ করে বাড়ির দোতলায় উঠে আসে।

সুন্দর সাজানো ঘর। নানা ফুলের মিলিত সুবাসে ঘরের বাতাস ম ম করছে। ধূপদানিতে সুগন্ধী ধূপ জ্বলছে আর মেজে জ্বলছে আগরবাতি। ফরাস পাতা রয়েছে মেঝেয়। মাঝখানে পানপাত্র সাজানো। পাশে নানা বাদ্যযন্ত্র।

লালন ঘরের দরজা পেরিয়ে সব দেখেশুনে তাজ্জব বনে যায়। আত্মগত সুরে বলে, এ আমি কোথায় এলাম !

নিধুবাবুর সাড়া পেয়েই বিপরীত দিকের দরজার পর্দা উড়িয়ে ঘরে ঢুকলো একজন রূপসী রমণী নাম মোতিবাঈ।

নিধুবাবু বলেন, কাকে ধরে এনেছি দ্যাখো—দেখেছো।

লালন কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে।

নিধুবাবু বলেন, বোসো বাউল।

তবুও দাঁড়িয়ে থাকে লালন।

এবারে মোতিবাঈ এগিয়ে এসে লালনকে বসতে বলে।

লালন তাকিয়ে থাকে রূপসী বাইজীর মুখের দিকে। বলে, আপনি যে দাঁড়িয়ে রইলেন মা।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাইজীর মুখের রঙ বদলে যায়। কতো জনের আসা-যাওয়া তার ঘরে, কিন্তু কেউ কোনদিন মা বলে ডাকে না। না জানি এ কেমন অতিথি !

বাইজী বসলো ফরাসের একান্তে। এবারে লালনও না বসে পারলো না।

নিধুবাবু বলেন, আজ তোমার গান শুনবো বাউল।

—গান! লালন বলে, আমার গান কি এখানে চলবে?

—কেন চলবে না। নিধুবাবু বলেন, গাও বাউল, অনেক দিন হৃদয়ের গান শুনিনি।

—তার চেয়ে আমরা আজ মায়ের গান শুনি না। দেখেশুনে মনে হচ্ছে এ-তো গানের রাজ্যে এসেছি।

মোতিবাঈ কেমন যেন লজ্জা পায় লালনের কথায়। লালনের কথা কিন্তু তখনো শেষ হয়নি। মোতিবাঈ-এর দিকে চোখ রেখে স্বগতোক্তির সুরে বলে, মায়ের আমার কতো সাজ। জামদানী শাড়ি পরনে, পায়ের আলতাকে লজ্জা দিচ্ছে নুপূর, তারপর হাতে কংকন, মাথায় খোঁপার সঙ্গে জড়ানো বেল কুঁড়ি—কিন্তু মা আমার টিপ পরেনি কেন? চাঁদ-সূয্যি না থাকলে আকাশ অন্ধকার, টিপ না থাকলে মায়ের মুখ আলো করবে কিসে?

অস্বস্তি মোতিবাঈ-এরও মনে। নিধুবাবু সহজ সুরেই বলেন, সবই তো শুনলাম। কিন্তু গান না শুনে তোমাকে ছাড়বো না বাউল।

কথার মধ্যে প্রবেশ করে রূপচাঁদ পক্ষী। সঙ্গে আরো দুজন।

লালনকে বসে থাকতে দেখে সবাই বিস্মিত দৃষ্টিতে ফিরে চায়।

লালনের মুখে মৃদু হাসি। নমস্কার জানিয়ে বলে, আপনাদের ঘরে এলাম আমি। এ আমার কতো বড়ো ভাগ্য—

রূপচাঁদ হাসিখুশি মানুষ। নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে বলে, নিজে এসেছো, না কেউ পথ চিনিয়ে এনেছে।

উত্তর দেন নিধুবাবু, হালদারবাড়ির রোয়াকে একে কুঁড়িয়ে পেলাম। ধরে এনেছি। ভেবেছি, আজ আমরা বাউলের গান শুনবো।

লালন বলে, এসেছি গানের মজলিশে। এখানে আমি তো শুনবো। খানদানি গানের আসরে একতারার সুর কি জমে?

নিধুবাবু একটু হেসে হারমোনিয়মটা কোলের কাছে টেনে নিলেন। মোতিবাঈ ইতস্তত করেও, এগিয়ে দেয় পানপাত্র। নিধুবাবুর মনের মধ্যে একটু সংকোচ—হাজার হোক ঘরে একজন নতুন অতিথি।

—নাও ধরো মোতি। নিধুবাবু পানপাত্র হাতে তুলে নিয়ে বলেন, বাউলকে একটা গান শুনিয়ে দাও।

—বাবুর গাইতে কী হয়েছে! মোতিবাঈ তির্যক দৃষ্টিতে তাকায় নিধুবাবুর দিকে। তারপর লালনকে লক্ষ্য করে বলে, আপনাকে এর সঙ্গে পরিচয়

করিয়ে দিই। ইনি হলেন কোলকাতার বিখ্যাত নিধুবাবু। লোকে বলে টপ্পাবাজ নিধুবাবু। আর উনি হলেন—মোতিবাঈ-এর মুখের কথা কেড়ে নেয় রূপচাঁদ। নিজের পরিচয় নিজেই দেয়। বলে, অধমের পরিচয় রূপচাঁদ পক্ষী নামে। উড়িষ্যার সন্তান। ভাগ্যচক্রে এসেছি কোলকাতায়। বাগ-বাজারের আটচালায় আমাদের পক্ষী দলের আড্ডা। নিধুবাবু হলেন, পাখির রাজা বাজপাখি।—কই হে নিধুবাবু এবারে শোনাও তোমার সেই 'ভালোবাসিব বলে ভালোবাসিনে'।

পান-জর্দা মুখে দিলেন নিধুবাবু। তারপর হারমোনিয়মের একটা কোণ হাঁটুর ওপর তুলে নিয়ে গান সুরু করলেন।

এই প্রথম টপ্পা শুনলো লালন। শুনে মুগ্ধ হলো। কিন্তু কিসের যেন অভাব গানের মধ্যে।

লালন বলে, গান তো গাইলেন বাবু। সুন্দর গান—জমাটি সুর। কিন্তু তেমন ভাব কই। ভাব না থাকলে সব যেন ফাঁকা মনে হয়। ভজন বলো, পূজন বলো—মনের মধ্যে ভাব না আনতে পারলে কিছু হয় না। গানও তেমনি। তারপর মায়ের ঘরে বসে গান গাইছেন, মাকে শোনাতে—তাতে ভাবের অভাব কেন? বেশ তো রসের ভিয়ানে পাক করেছেন—কিন্তু পুরটুকু দিতে ভুলে গেলে চলবে কেন? সেই পুরটুকু হলো ভাব।

বলে লালন একতারা তুলে নেয় হাতে। একতারার সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে আরম্ভ করে,

'ভাবের উদয় যেদিন হবে
সেদিন হৃদ-কমলে রূপ ঝলক দিবে।'

শুধু গান নয়, গানের সুরে লালন বলে যায় তার মনের কথা।

আসরে সবাই মুগ্ধ হয় লালনের গানের ভাষায়, ভাবে আর সুরে।

নিধুবাবু এতোক্ষণে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার পরিচয় তো পেলাম না বাউল।

—পরিচয় আবার কি? মানুষটা বসে আছি বাবুমশায়দের সামনে, সেটা কি কিছু নয়। সোনার নাম সোনা না হয়ে তো হীরে হতে পারতো। তাতে সোনা তো আর হীরে হতো না। যে নামেই ডাকা যাক না, মানুষ মানুষই থেকে যায়।

—কিন্তু কিছু জানতে ইচ্ছে করে তো?

—করে বৈকি। লালন বলে, জানার ইচ্ছেটাই তো আসল। সারাটা জীবন এই ইচ্ছে নিয়েই ঘুরি, কিন্তু ইচ্ছে পূরণ আর হয় না। এই ধরুন না, ইচ্ছে ছিল কালীঘাটে এসেছি, একবার মায়ের মন্দিরটা ভালো করে দেখবো। তা আর হলো না। এখানে মানুষ নাম ভুলে গেছে সবাই। ফকির-বাউলের বেশ দেখে কেউ মন্দিরে যেতে দেয় না। সবাই জানতে চায়, আমি কোন্ জাতের? কিন্তু বিশ্বাস করুন বাবুমশায়, কোনো জাতের খবর আমার জানা নেই।

নিধুবাবু চুপচাপ। রূপচাঁদ পক্ষীর মুখেও কোন কথা নেই।

লালন এবারে মোতিবাঈ-এর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, কি গো মা—ঠিক বলেছি তো। লেখাপড়া তেমন জানিনে,—ধর্ম অধর্ম জ্ঞান নেই—সাঁইজীর কৃপা আছে, তাই এমন করে কথা বলতে পারি।

রূপচাঁদ বলে, তোমাকে একবার পক্ষীর আড্ডায় যেতে হবে।

লালন বলে, না গো—আড্ডায় আমি যাবো না। রাত পোহালেই পালিয়ে যাবো। কলকেতা শহরে আমার দম আটকে আসছে। আগে জানলে আসতাম না এ-শহরে। এখানে ভালো মানুষ পাগল হয়ে যায়।

বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে লালন। তারপর মোতিবাঈ-এর দিকে তাকিয়ে মিনতি জানিয়ে বলে, মা গো—দু রাত ঘুমোইনি আমি—একটু জায়গা দেবে ঘরের বাইরে। শুয়ে পড়ি।

—ঘরের বাইরে কেন? মোতিবাঈ বলে, ঘরেই শোও তুমি।

—না, না- ঘরে কেন? এখন তো তোমরা গান-বাজনা করবে।

—তা হোক। তুমি ঘরেই থাকো বাউল। আমি বিছানা পেতে দিচ্ছি।

—না মা, বিছানা পাততে হবে না। আমি এই ঝোলা মাথায় দিয়েই শুয়ে পড়বো।

—সে কি হয়?

—বাউলের যে আরাম ভোগ করতে নেই মা।

এরপর আর কাউকে কিছু বলার অবসর দেয় না লালন। ঘরের একান্তে নকসী কাঁথার ঝোলা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ে লালন। ক্লান্ত সে—ঘুমিয়ে পড়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই।

রাত শেষ হয়। লালন তখনো গভীর ঘুমে অচেতন। মোতিবাঈ চুপচাপ জেগে বসে আছে জানালার কাছে। নিধুবাবু, রূপচাঁদ পক্ষী ও আরো যাঁরা, আগেই চলে গেছেন।

মোতিবাঈ-এর চোখে মুখে রাত জাগার ক্লান্তি। অবসাদ তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে। তবু জেগে আছে সে। মাঝে মাঝে দেখছে নিদ্রিত বাউলের মুখের দিকে।

এক সময়ে ঘুম ভেঙে যায় লালনের। উঠে বসে। সামনেই উন্মনা মোতিবাঈকে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়।

—মা! মাগো!

লালনের ডাকে চমক ভাঙে মোতিবাঈ-এর।

—মা বলে ডেকে আমার পাপ বাড়িও না বাউল। হঠাৎ কেমন যেন উতলা হয়ে মোতিবাঈ বলে, জানো না, আমরা রূপের ব্যবসা করি।

—কি করে জানবো মা। লালন বলে, আমি মনের কারবারি, মনের কথা যদি কিছু থাকে শোনাও মা।

—মন! মন যে মরে গেছে?

—দুর, মন আবার মরে নাকি? মন মরে গেলে ঈশ্বর মরে যাবে।

— তুমি কি বলছো বাউল!

—হ্যাঁ গো, ঠিকই বলছি। এই পঞ্চভূতের দেহটা নিয়ে মজে আছি আমরা—মনের খবর রাখার সময় কই! অথচ মন—সে ঠিকই থাকে। একদিন না একদিন তাকে আমরা খুঁজে পাই।

মোতিবাঈ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এই বিচিত্র বাউলের মুখের দিকে।

লালন আবার বলে, মা—দেহটাকে কতো যত্ন করে সাজাও, মনের দিকে একবার ফিরে তাকাও না। মনটাকে খাঁচায় পুরে রেখে দেহটাকে সুখ দিতে চেয়ো না মা।

মোতিবাঈ-এর চোখ দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ে।

লালন বলে, এবার আমি যাই মা।

—না না। মোতিবাঈ ভুলে গেছে চোখের জল মুছতে। বলে, তুমি যেও না।

—সে কি হয়! আমাকে যে যেতেই হবে। পথ ভোলা পথিক পথ

চলতে একটা রাতের জন্যে আশ্রয় নিয়েছিল তোমার ঘরে—সে কি চার দেয়ালের ঘরে একদিন ছাড়া দুদিন টিকতে পারে ?

উঠে দাঁড়ায় লালন। হাতে তুলে নেয় খঞ্জনী আর একতারা। মোতিবাঈ-এর সজল চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, চোখের জল মুছে ফেল মা।

—সত্যি তুমি চলে যাবে বাউল ?

—হ্যাঁ মা। নিধুবাবুকে বলে দিও মা, তাঁর কথা আমি কোনদিন ভুলবো না। বাবুর গানের কথা আমার মনে থাকবে, নিধুবাবু যে সে বাবু নয়—গানের রাজা।

এবারে মোতিবাঈ নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারে না। এসে লুটিয়ে পড়ে লালনের পায়ের কাছে।

—ওকি করছো—তুমি যে আমার মা। মা কি সন্তানের পায়ে হাত দেয়! ওঠো মা।

বলে লালন দুহাত দিয়ে তুলে ধরে মোতিবাঈকে।

—তুমি বলে দাও বাউল, কি নিয়ে বেঁচে থাকবো আমি ?

—মা! লালন আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বলে, বেঁচে থেকেও ও কথা কেন মা!

—না, না—আমি এমন করে আর বাঁচতে চাই না। সত্যি বলছি, আমি মা হয়ে বাঁচতে চাই।

—আমি তো তোমাকে মা বলে ডেকেছি, লালনের মুখে মৃদু হাসি। বলে, এই বুড়ো ছেলেটাকে মনে ধরছে না বুঝি। ঠিক আছে মা, তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে।

মোতিবাঈ আরো কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারে না একটি কথাও।

লালন শান্ত-মধুর কণ্ঠে বলে, আরশিতে মুখ ভাসে, আর মন ভাসে মনের আরশিতে। আর ভালোবাসলে পাওয়া যায় ভালোবাসা। গানের রাজা নিধুবাবু, তিনি তোমাকে ভালোবাসার গান শেখাবেন। অমন সুরের জাল যিনি বুনতে পারেন, তিনিই পারবেন তোমার জীবনে ভাব আর ভালোবাসার ফুল ফোটাতে। নিধুবাবুকে বোলো আমার কথা। আমার জন্যে বাবু অনেক করেছেন, বিপদের সময় আমার সাঁইজীই তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

লালনের দৃষ্টি মোতিবাঈ-এর দিকে। আর মোতিবাঈ তখনো নীরবে চোখের জল ফেলছে।

লালনের কথা এখনো শেষ হয়নি। ভাব-কাতর কণ্ঠে বলে, মা—তোমার চোখের জলের সঙ্গে জীবনের সব ময়লা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। জানো মা—মানুষ নিজে কাঁদে না, ভিতর থেকে আর একজন তাকে কাঁদায়। যে কাঁদতে জানে, তার মন মরে যায়নি মা।

এবারে একতারায় ঝংকার তোলে লালন। বলে, দেহের মধ্যে একটা সুক্ষ্ম তার রয়েছে, সেইটাই তো মন। আবার একতারা যেমন নিজে বাজে না, তেমনি মানুষও নিজে থেকে কাঁদে না—রসুলের এমনই কারবার।

কথার মধ্যে লালন ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তার হাতের একতারাটা তখনো বাজছে।

লালন চলে যাবার পরেও মোতিবাঈ দাঁড়িয়ে থাকে পাষাণ-মূর্তির মতো। তারপর কি যে হয় তার, অশান্ত কান্নার আবেগে ভেঙে পড়ে।

আবার শুরু হয় লালনের পথ চলা।

গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে আবার পূর্ব বাংলায় এসে পৌঁছয় লালন। পথ চলে লালন। যেমন তার চলারও বিরাম নেই, তেমনি নেই তার গানের। মনের আনন্দে গান গেয়ে গেয়ে পথ চলে।

পথে পথে আরো কিছু দিন কেটে যায়। পথশ্রমে শ্রান্ত লালন এক দিন অপরাহ্ণে এসে পৌঁছয় তার নির্দিষ্ট আখড়ায়।

সাকিনা ফুলের চারায় জল সিঞ্চন করছিল। লালনকে দেখেই ছুটে আসে।—এতদিনে এলে?

—কদিন আর।

—হিসেব আছে?

লালন কেমন যেন বোবা দৃষ্টি তুলে চেয়ে থাকে সাকিনার মুখের দিকে।

কতো বদলে গেছে সাকিনা। আগের চেয়ে কতো শীর্ণ হয়েছে, মাথার চুলেও পাক ধরেছে। তারপর মুখের রেখাও আগের চেয়ে আরো গম্ভীর।

এবারে লালনের হুঁশ হয়। বলে, তুমি এত বদলে গেছ সাকিনা!

—দেহের ওপর দিয়ে বয়সটা হেঁটে যাচ্ছে, তার পথ পড়বে না? অবাক হয়ে দেখছো কি? নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছো?

—তোমাকে আরশি করে নিজেকে দেখছি।

সাকিনা মুখ টিপে হাসে।

—হাসছো যে ?

—তোমার কথা শুনে।

এবারে লালনও উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে। বলে, সাকিনা আমার মনটা কিন্তু তেমনি তাজা রয়েছে। যেমন ছিল। বাউল মনের বয়েস বাড়ে না, সে বুড়ো হয় না।

কথার শেষে একতারা আর খঞ্জনী বাজাতে আরম্ভ করে নৃত্যের ছন্দে।

সাকিনা হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকে এক বিন্দুতে স্থির হয়ে।

'আমার পাড়ার কাছে আরশি নগর, পড়শী বসত করে'—গানের সুর বাজছে একতারায়। আর সেই সুরে মাতোয়ারা হয়ে নাচছে বাউল লালন।

লালন ফিরে আসাতে আখড়া আবার সরগরম হয়ে ওঠে। ভক্তের দল ভিড় করে। কতো দিন পর ফিরে এসেছে তাদের লালন সাঁই। কতো-দিন পর আবার আখড়ায় বাউল গানের সুর জেগেছে।

লালন সাধন বেদীর ওপর বসে। সমবেত ভক্তজনেরা শুনছে লালনের অমৃত-বাণী।

লালন বলছে, আমরা পাগলের মতো খুঁজে বেড়াই ভগবানকে। হিন্দুদের ভগবান, মুসলমানের আল্লাহ্। আবার সাদা চামড়ার ফিরিঙ্গিরাই তাকে বলে গড। সবাই তাদের ভগবানকে খুঁজে বেড়ায়, মন্দিরে, মসজিদে না হয় গির্জায়। কিন্তু কোথায় ভগবান ? খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাই, পাই না।

শীতল বলে, তবে কি তাঁকে পাওয়া যায় না সাঁইজী ?

লালন বেশ জোরের সঙ্গে বলে, কেন যাবে না। ঈশ্বরকে আমরা সব সময়ে চোখের সামনে দেখছি।

শীতল বলে, কোথায় ?

—এই তো তোর মধ্যে তাকে দেখছি। অতদূর নাই-বা গেলাম। নিজের মধ্যেই তো খুঁজে পাই তাঁকে। জলের মধ্যে খেলে মীন—মানব দেহের মধ্যে নিত্য লীলা করেন তিনি। আচার-অনুষ্ঠান দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। প্রেম দিলে তাঁকে পাওয়া যায়। আর সে প্রেমের এমনই মজা, মানুষকে পাগল করে দেয়। জানিস তো, নদীয়ায় গৌরচাঁদ পাগল হয়েছিল তাঁর প্রেমে। ব্রজের গোপবালারা কুল-মান সব ভুলেছিল কৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের প্রেমে।

'শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে কে আর পায়।
ও সে না মানে আচার, না মানে বিচার—
প্রেমের রসে রসিক সে দয়াময়।'

এবারে শুধু কথা নয়, গানে গানে সে তার সাধন বাণী শোনায়। ভক্ত-জনেরা মুগ্ধ হয়ে শোনে।

লালনের কথা যখন শেষ হয়, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

কথা শেষ হতে সাকিনা ডালা হাতে আসে প্রসাদ বিতরণ করতে। বাতাসা আর ছোলা ভিজোনো—আখড়ার নিত্য প্রসাদ এই।

প্রসাদ বিতরণের পালা চুকতে যে-যার চলে যায়। শুধু শীতল, ভোলাই, পাঁচুর মতো একান্ত অনুগত ভক্তেরা তখনো লালনকে ঘিরে বসে থাকে। ওদের যাবার সময় এখনো হয়নি। অনেক সময় ওরা ঘরে ফেরে না। আখড়াতেই থেকে যায়।

দেশ পর্যটন করে ক'বছর বাদে ফিরেছে লালন। তাই সাকিনা মানত করেছিল শিরনির।

কিন্তু কদিনের মধ্যে লালনকে সে কথা বলার অবসর পায়নি। আজ সুযোগ বুঝে মনের ইচ্ছেটা ব্যক্ত করলো সাকিনা।

শুনে লালন বলে, বেশ তো—একদিন মাছের পুনাদের মিষ্টিমুখ করাও।

সাকিনা বলে, আমি মেয়েমানুষ—কি করবো ?

—ওমা ? মেয়েমানুষ তা কি হয়েছে! মেয়েরা কম কিসে। জগতটাকে তারাই তো ধারণ করে আছে।

—তোমার ওসব কথার মানে বুঝিনে।

—সে কি! এতদিন আমার সঙ্গে ঘর করেও এসব সহজ কথার মানে শিখলে না। শুধু পদ্ম তুলতে জলে ডুবে হাবুডুবু খেলে ? বলে লালন মুখটিপে হাসে।

সাকিনা বলে, অমন করে হেসো না।

লালন বলে, হাসবো না—তুমি যে আমার দেখনহাসি।

—দেখবে ? বলে সাকিনা আচমকা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয় প্রদীপের আলো।

—অন্ধকারেও আমার চোখ জ্বলে সাকিনা। ও আলোটা তো

বাহ্যিক, কিন্তু অন্তরে যে আলোটা জ্বলছে, সেটা তো নেবাতে পারবে না।

সাকিনা হার মানে। বলে, তোমাকে আমি এঁটে উঠতে পারবো না। যাক গে—এখন শিরনির কি করবে বলো।

লালন বলে, বেশ তো, মানত যখন করেছো তখন তো একটা কিছু করতে হবে। যা হোক করলে হবে।

সাকিনা বলে, আমার ইচ্ছে, গাঁয়ের লোককে বলবো।

—বেশ তো। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেব—বলে লালন আবার হাসতে আরম্ভ করে।

এবারে সাকিনা উঠে পড়ে। তার অনেক কাজ। রান্নাবাড়া কিছুই হয়নি।

আখড়ার ছোট ঘর। এ ঘরটি এবারে নতুন বেঁধেছে লালন।

ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। মাতুরের ওপর বসে কি সব লিখছে লালন। পাশে বসে সাকিনা। কাঁথা সেলাই করছে। তারই মধ্যে দুজনের কথাও চলছে।

সাকিনা বলে, সারা দিন তো ঘুরে ঘুরে কাটাও—রাত না হলে তোমার লেখা হয় না। জানো কতো রাত হয়েছে?

লালন বলে, তুমি কাঁথা সেলাই করছো, আমি লিখছি। এ কাজগুলো তো দিনের আলোয় করতে পারো।

—এসব কি দিনের কাজ?

—আমারও তো সেই কথা। এ-সব কি দিনের কাজ। বলে কাগজ কলম গুছিয়ে রাখে লালন।

—কি হলো! লেখা বন্ধ করলে যে?

—আজ থাক, অনেক রাত হয়েছে।

—সাকিনার হাতের সূঁচে তখনো অনেকখানি সুতো। বলে, আর একটু লেখো, এই সুতোটা ফুরিয়ে যাক।

—তুমি সেলাই করো। লালন বলে, আমি ততক্ষণ এক ছিলিম তামাক টানি। কই গো—একটু তামাক সেজে দাওনা।

—এই রাতে আবার তামাক খাওয়া? এমন নেশা না করলে নয়?

—নেশার মর্ম বুঝবে কি ?

—থাক, আর বোঝাতে হবে না। বলে সাকিনা তামাক সাজবার জন্যে উঠে যায়।

দু' হাঁটুর মধ্যে হুঁকো রেখে তামাক টানতে আরম্ভ করে লালন। বলে, আমি একটা কথা ভাবছি।

—কি ?

—ভাবছি, কাল পূর্ণিমা আছে। শিরনির পাটটা চুকিয়ে নিই।

সাকিনা বলে, সে কি করে হবে। দু দিন সময় না পেলে জোগাড়-যন্তর হবে কি করে।

—সব ভূতে জোগাড় করে দেবে। লালন এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, যার জোগাড় সে-ই করে নেবে।

—কি জানি, তুমি তো বললে, সাকিনা একটু চিন্তা নিয়ে বলে, ফকির বাউলের ঘর—পরের দরজায় হাত না পাতলে যাদের দিন চলে না—

লালনের মনে কিন্তু কোনো চিন্তাই নেই। বেশ সহজ সুরে বলে, গুরুর চরণ ভরসা। সাঁইজীর নাম স্মরণ করলে, দেখবে—যাঁর জিনিস, তিনিই তা জোগাড় করে নিয়েছেন। ভাবনা কি সাকিনা, শিরনি মানত করেছো তুমি —সাঁইজীর নাম নাও, দেখবে সব চিন্তা হারিয়ে গেছে। সকালে উঠে তুমি একটা কাজ কোরো—ভোলাই আর পাঁচুকে বলে দিও—ওরা যেন পাড়ায় পাড়ায় বলে আসে।

—আমি কিন্তু ভালো বুঝছি না।

—দুর, আমি আমি ছেড়ে দাও। তুমি দিলে আমার ওপর ছেড়ে, আমি দিলাম সাঁইজীর নামে ছেড়ে। যা হবার তাই হবে। বলে মনের আনন্দে তামাক টানতে আরম্ভ করে লালন।

সকাল হয়েছে।

ভোলাই আর পাঁচু গেছে পাড়ায় পাড়ায় শিরনির কথা জানাতে। সন্ধ্যে-বেলা শিরনি হবে লালনের আখড়ায়।

লালন নিশ্চিন্ত! কিন্তু সাকিনা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। কি করে কি হবে এই তার ভাবনা।

শেষটা লালনের কাছে আসে। বলে, কি হলো নিশ্চিন্তে বসে রইলে

যে ? সন্ধ্যেবেলা যখন এ-পাড়া সে-পাড়ার লোক ভিড় করবে—কি হবে ভেবে দেখেছো ?

—যার ভাবনা সেই ভাববে। লালনের কণ্ঠে নির্লিপ্ততা। বলে, তুমি আমি ভেবে কি করবো।

—কিন্তু এতো লোকজনকে বলেছো—অথচ কিছুরই জোগাড় নেই। সাকিনা বলে, কি যে হবে।

—দেখো, আমার মন বলছে সময় মতো সব জোগাড় হয়ে যাবে। তারপর তোমার মানত বলে কথা—শুধু দুধ-পিটুলি দিলে তো হবে না, মেঠাই-মণ্ডাও চাই। নয়তো লোকে বলবে কি ?

শুধু এই কথা বলার অবসর। হঠাৎ বাইরে থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, এই কি লালন সাঁই-এর আখড়া।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

লালন উঠে যায়। দেখে, আট-দশ জন লোক 'ভারি' নিয়ে এসেছে। তাতে নানা সামগ্রী। চাল ডাল থেকে আরম্ভ করে নানা রকমের ফল মিষ্টি।

—কি গো ; লালন জিজ্ঞাসা করে, এ-সব কোথায় যাবে গো ?

উত্তর এলো, আমরা আসছি মোহনপুর থেকে।

—তা তো বুঝলাম, লালন বলে, কোথায় যাবে এসব ?

—এই তো সাঁইজীর আখড়া ? মাথার মোট নামিয়ে রেখে একজন বলে, মোহনপুরের মোড়লবাড়ি থেকে আসছি। এসব আখড়ার ভেট।

সাকিনাও ততোক্ষণে এগিয়ে এসেছে। দেখেশুনে সে যেন কেমন অবাক হয়ে গেছে।

—তোমরা ভুল করোনি তো ? বলে লালন ফিরে চায় সাকিনার মুখের দিকে।

—না বাবা। আমরা আগেভাগে এলাম। মোড়লবাড়ির লোকজন আসছেন পিছনে।

এবারে আর কথা নয়, ওরা জিনিসপত্তর নামিয়ে রাখে আখড়ার প্রাঙ্গণে লালন বলে, আরাম করো তোমরা। সাকিনা যাও—এদের জল-বাতাস দাও গে।

কিছুক্ষণ বাদেই মোহনপুরের মোড়লবাড়ির লোকজন এসে পৌঁছয়। তাদের মুখ থেকেই শুনলো লালন, মোড়লবাড়ির ছোট ছেলের অসুখ করেছিল। মানত ছিল, অসুখ ভালো হলে আসানপীরের শিরনি দেবে। আজই সন্ধ্যায় শিরনি দেবার কথা ছিল বাড়িতে। কিন্তু গত রাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছে মোড়লবাড়ির কর্তা। কে একজন যেন মাথার কাছে এসে বলছে, ওরে—তুই শিরনি দিতে যা লালন সাঁই-এর আখড়ায়।

লালন দাঁড়িয়ে শুনছে স্বপ্ন কথা। শুনছে আর সাকিনার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখটিপে হাসছে।

সাকিনার মুখে কথা নেই। ব্যাপার-স্যাপার দেখে সে তাজ্জব বনে গেছে।

লালন চিৎকার করে বলে, ওরে কে আছিস রে—কর্তাদের বসবার জায়গা করে দে। জল পান দে। কর্তারা অনেক দূর থেকে আসছে।

সাকিনা তখনো দাঁড়িয়ে আছে পাশে। লালন বলে, যাও সাকিনা—রসুই করো গে। কর্তাদের জন্যে ভালো করে রসুই করো।

লালন এবারে হাসতে আরম্ভ করে সাকিনার মুখের দিকে তাকিয়ে।

সন্ধ্যে না হতেই গ্রামের মানুষ ভিড় করলো লালনের আখড়ায়। শুধু গ্রাম নয়—গ্রামান্তরের নর-নারীও এসেছে খবর পেয়ে।

লালনের শিষ্য-সেবকরা শিরনির আয়োজনে ব্যস্ত। ভক্তজনরাও সাহায্য করছে নানা কাজে। সাকিনারও কাজের অন্ত নেই। সব কিছুই দেখতে হচ্ছে, করতে হচ্ছে।

কিন্তু এত কাজের মধ্যেও লালন নিশ্চিন্ত। সকলের দৃষ্টির আড়ালে সে চুপচাপ বসে আছে অশ্বত্থের ছায়ায়।

এক সময় সাকিনা আসে লালনের কাছে। বলে, কি গো—সেই থেকে চুপচাপ বসে আছো যে?

—তুমি তো আছো। এ-সব তোমার কাজ।

—তবু একবার দেখবে তো?

—দেখার কি আছে! হাজার হাতে কাজ হচ্ছে, সেখানে এই অকাজের দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে কি হবে।

—কিন্তু কি হচ্ছে না হচ্ছে দাঁড়িয়ে দেখতেও তো পারো! তুমি কাছে থাকলে আমি সাহস পাই। এসো—

লালনকে এক রকম জোর করেই আখড়ার প্রাঙ্গণে নিয়ে আসে সাকিনা।

লালন দেখে-শুনে অভিভূত হয়ে যায়।

গ্রাম-গ্রামান্তরের নর-নারী এসেছে তার আখড়ায়। এ যেন্ এক মহোৎসব।

লালন ঘুরে ঘুরে দেখছে। মুখে তার শিশুর মতো হাসি।

—ওরে, এ-সব 'পুনার দল' কোথায় ছিলরে এ্যাদ্দিন। এক সময় লালন বলে ওঠে, এ যে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছে। বাঃ, বাঃ, এই না হলে আনন্দ।

কাছেই দাঁড়িয়েছিল ভোলাই। বলে সাঁইজী—তুমি স্থির হয়ে বসো এক জায়গায়।

লালন বলে, বসেই তো ছিলাম। কিন্তু বসে থাকার কি জো আছে।

—একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল সাকিনা। সে দিকে চোখ রেখে লালন বলে, ওই যে আমার আধখানা জীবন দাঁড়িয়ে আছে, ওকি আমাকে বসে থাকতে দেয়।

—ওরে বাব্বা, খাশমহলে যে বেজায় ভিড়।—ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কাঙাল হরিনাথ এগিয়ে আসছেন।

—কাঙাল!

লালনের তুচোখে বিস্ময়।

—হ্যাঁ রে, অনেক তীর্থ ঘুরে এলাম—শেষে সর্বতীর্থের সার, জন্মভূমিতে। মন তিষ্ঠোলো না। তাই তো চলে এলাম।

—ওরে কে আছিস, জলচৌকি এনে দে। খাশমহলের খোদ লাটসাহেব এসেছে।

—আরে, আমি আবার লাটসাহেব হলাম কবে?

—ছিলে ফিকিরচাঁদ, হলে কাঙাল। তারপর তীর্থ-ধর্ম করে একেবারে লাটসাহেব হয়ে ফিরেছো। কিন্তু তুমি যে একেবারে বুড়িয়ে গেছো?

—আর তুমি!

তু'জন—তু'জনের মুখের দিকে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে।

আকাশে আজ পূর্ণ চাঁদের আলো। তারপর আখড়ার পরিবেশে আজ হাজার বাতির রোশনাই।

শিরনি প্রসাদ গ্রহণ করতে আখড়ার অঙ্গন-প্রাঙ্গণ জুড়ে বসেছে সবাই। হিন্দু-মুসলমান, নর-নারী—কোথাও কোনো তফাৎ নেই। শীতল, ভোলাই, পাঁচুর মা—আরো সব ভক্ত প্রসাদ বিতরণ করছে। তদারক করছেন কাঙাল হরিনাথ। সাকিনাও কম যায় না। সে নিজেই ভাণ্ডারে দাঁড়িয়ে।

হরিনাথ বলেন, মা আমার অন্নপূর্ণা।

লালন বলে, দুর—ও তোমার অন্নপূর্ণা হবে কেন? কাশী ঘুরে এসে বুঝি এই বুদ্ধি তোমার হয়েছে। ও-তো আমার খেলা ঘরের ঘরণী! মানবী—তাই সামলাতে পারি না, এর ওপর দেবী হলে আর রক্ষে ছিল না।

কাঙাল হরিনাথ মিষ্টি সুরে হাসেন। বলেন, লালন—ওকে তুমি সামলাও, না তোমাকে সামলায় ও।

—দাঁড়াও, অঙ্ক কষে দেখি।

—যাক, আর অঙ্ক কষতে হবে না। কাঙাল হরিনাথ এগিয়ে যান সাকিনার কাছে। দু হাত প্রসারিত করে বলেন, কই আমাকে তো প্রসাদ দিলে না? কই হে ছোট সাঁই প্রসাদ নেবে না? এসো।

সে এক মজার দৃশ্য!

লালন আর কাঙাল হরিনাথ আখড়ার দোচালার অঙ্গনে দু হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে। সাকিনা দু জনকে প্রসাদ দিচ্ছে। ভক্তজনেরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে এই দৃশ্য।

লালনের আখড়ায় শিরনির ঘটনা নিয়ে কথা উঠলো সমাজে। রক্ষণশীল হিন্দুরা বলে, এ অনাচার সহ্য করা হবে না। মুসলমান ফকিরের এতো বড় স্পর্ধা। ওর আখড়া তুলে দিতে হবে। নইলে সমাজের বন্ধন বলে কিছু থাকবে না।

রক্ষণশীল মুসলমানের মুখেও ওই একই কথা। তারা বলে, এ কোন্ দেশী কথা। জাত মান সবই যাবে শেষটা। দিনে-রাতে এই বেলেল্লাপনা সহ্য করা হবে না।

শুধু সেউড়িয়ায় নয়, আশেপাশের গ্রামেও নানা কথার গুঞ্জন উঠলো লালনকে নিয়ে।

এই সব কথা যথাসময়ে লালনের কানে এসে পৌঁছয়।

লালন বলে, ওরা বলছে বলুক—জাত জাত করে গোটা জাতটাই গেল। মানুষগুলো যদি দিনকতক জাত-ধর্মের কথা ভুলে যেত, তাহলে মানুষ হবার সুযোগ পেত। জাত—কিসের জাত, কিসের ধর্ম! ধর্ম তো শিকেয় উঠেছে, তবু যায় না জাতের মান।

একদিন সন্ধ্যায়।

লালনের আখড়ায় সমবেত হয়েছে ভক্তজনেরা। লালন বলছে ভক্ত জনদের উদ্দেশ্য করে, আমি জাত মানিনে, ধর্ম মানিনে। আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। একটা সহজ কথা জানি, মানুষের ঘরে জন্মেছি। মানুষের ঘরে বড় হয়েছি। মানুষের যদি কিছু ধর্ম থাকে, তবে তাই নিয়েই বেঁচে আছি।

কথার শেষে লালন হাতে তুলে নেয় একতারা। গাইতে আরম্ভ করে,

'সব লোকে কয়, লালন কি জাত সংসারে,

জাতির কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।'

গান শেষ হয়। লালনের কথা শেষ হয় না। সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলে যায় তার মনের কথা। সমবেত নর-নারী অবাক হয়ে শোনে তাদের লালন সাঁই এর কথা।

শুধু কি একদিন, লালনের আখড়ায় প্রতি সন্ধ্যায় ভক্তজনেরা আসে। দূর-দূর গ্রাম থেকেও আসে কতো জন। অনেকে আবার আখড়াতে কাটিয়ে যায় দু'চার দিনের জন্য।

মানুষ দেখলেই লালনের আনন্দ। যেমন লালন তেমনি সাকিনা। কখনো কোনো অবস্থাতেই বিরক্তি নেই। অথচ সরল হাসিটা যেন সব সময়ে জড়িয়েই আছে মুখে।

এমনি করেই চলে দিন। দিনের পর দিন। সাধন-ভজন তো আছেই, আর রয়েছে গান বাঁধা।

চলতি দিনেরই একটা দিন।

লালন আপন মনে নদীপারের পথ ধরে আসছিল। কণ্ঠে ছিল গানের সুর। মন ছিল তার একতারায়। লক্ষ্য করেনি পথের মাঝে গর্ত রয়েছে,

গর্তে পা পড়তেই পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে লালন। তারপর কোনমতে উঠে দাঁড়ায়।

কিন্তু পা ফেলতে হলো বিপদ। অসহ্য যন্ত্রণা পায়ে। তবু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনো মতে পথ চলে লালন।

মাঠে চাষ করছিল গ্রামের চাষী। লালনকে খুঁড়িয়ে চলতে দেখে এগিয়ে আসে।

—কি হয়েছে সাঁইজী?

—দু'খানা পায়ে ভর করে চলাফেরা করতাম। তা-ও বোধহয় আর পারবো না। এই বয়সে পা ভাঙলে আর কি জোড়া লাগবে?

—সাঁইজী, চলো—তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—নারে, আমি একাই যেতে পারবো।

—ওই পা নিয়ে যাবে কেমন করে?

—ঠিকই যাবো,, গুরুর কৃপা থাকলে খোঁড়াও পাহাড় ডিঙিয়ে যায়। বোবাও কথা বলে।

বলে লালন একাই চলতে আরম্ভ করে।

আখড়ায় পৌঁছতেই সাকিনা ছুটে আসে—কী হয়েছে তোমার? ওকি, পা অমন ফুলেছে কেন?

—সাকিনা! পা-খানি বোধ হয় ভেঙেছে। লালন দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও কতো সহজ সুরে বলে, যাক গে—এক এক করে সবই তো যাবে।

সাকিনার কাঁধে ভর করে লালন আখড়ার দাওয়ার ওপর বসে পড়ে। বলে, আজ পা গেছে কাল হাত যাবে, এমনি করে একদিন মুখ থুবড়ে পড়বো?

—ও কথা বলছো কেন? সাকিনার মুখের রঙ বিবর্ণ হয়ে যায়। কেমন যেন অমঙ্গল আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে ওঠে। তবু মুখ ফুটে কিছু বলে না। স্বামীর আহত পা কোলের ওপর তুলে নিয়ে বলে, বলো, এখন কি করবো—কাকে ডাকবো?

—কিছু করতে হবে না। শীতল এলে তাকে বলে দিও, সাঁই-বাবার কবরের মাটি যেন এনে দেয়। যদি সারার হয় ওই মাটিতেই সারবে।

সাকিনার দুটি চোখ সজল হয়ে ওঠে! এক সময় আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে চোখের জল।

লালন যাই বলুক, সাকিনা কোনো কথা কানে নেয় না। জলপটি দিয়ে বেঁধে দেয় স্বামীর পা। নতুন করে মানত করে সাঁইবাবার নামে। তারপর লালনের সাধনবেদীর সামনে বসে মনে মনে প্রার্থনা করে, সাঁইবাবা—তুমি ওর পা ভালো করে দাও।

লালন সুস্থ হলো বটে, কিন্তু আহত পায়ে তেমন জোর পেল না। তবু পায়ে পায়ে চলতে আরম্ভ করলো।

কিন্তু ঠিক মতো চলতে পারে না। পা টেনে টেনে খুঁড়িয়ে চলতে হয়। চলতে চলতে লালন হাসে। বলে, এবারে গুরু আমারে আচ্ছা জব্দ করেছে।

আজকাল চলাফেরার সময়ে কেউ না কেউ সঙ্গে থাকে। সেদিন সঙ্গে ছিল ভোলাই।

ভোলাই পাশে পাশে পথ চলছিল। বলে, সাঁইজী—এবারে স্থির হয়ে বোসো। অনেক দিন তো ঘুরে বেড়ালে।

—ওরে ছোঁড়া, বাউলের কি বসে থাকার জো আছে। বসে থাকলেই পিঠে সপাং সপাং করে কড়া চাবুক পড়বে। বুঝলি? ফকির বাউলের বসে থাকার মানে ধর্মনাশ।

আরো কিছু পথ এগিয়ে যায় কথা বলতে বলতে। তারপর, একটা ছায়া জড়ানো গাছের নিচে থমকে দাঁড়ায়। বলে, কোথায় এলাম রে ভোলাই? আজকাল রোদ চড়লে চোখেও কেমন ধাঁধাঁ লাগে। বয়েস হলে নানান খানা। চেনা জায়গা দেখেও চিনতে পারি না।

ভোলাই বলে, শিলাইদহে এসেছি।

—শিলাই দ', লালন বলে, তাহলে অনেক পথ এসেছি বল। চল, এসেছি যখন বাবুদের কাছারি বাড়ি ঘুরে আসি।

—সে এখনো অনেক পথ।

—হোক গে। ফেরার পথে না হয় ডিঙিতে ফিরবো। জানিস, বাবুরা আমারে বড্ড ভালোবাসেন। আমি কি এমনি যাচ্ছি রে—ভালোবাসার টানে যাচ্ছি। জানিস মহর্ষি ঠাকুর যখনই আসতেন, আমারে ডেকে পাঠাতেন! গান শোনাতাম মহর্ষি ঠাকুরকে। তত্ত্ব কথা শোনাতাম। তারপর তাঁর মন ছিল কি? যখনই এসেছি, ফকিরের ঝোলা ভরে দিয়েছেন টাকা-পয়সা, কাপড়,

কলকাতার মেঠাই, তারপর সাকিনার জন্যে বেনারসী চিকন শাড়ি—বলতে বলতে লালন চলতে আরম্ভ করে।

ভোলাই নীরবে অনুসরণ করে লালনকে।

ঠাকুরবাবুদের কাছারি বাড়ির কাছে এসে লালন বলে, জানিস ভোলাই, এখানে এলে মনটা হুহু করে ওঠে। মনে পড়ে মহর্ষি ঠাকুরের কথা। দরদালানে মহর্ষি ঠাকুর বসে থাকতেন। মানুষ না তো, সুয্যি ঠাকুর। চারদিকটা যেন আলো হয়ে থাকতো। এখন সব আছে—কিন্তু সুয্যি নেই।

কাছারি বাড়ির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায় লালন। কাছারি বাড়ির বারান্দায় পায়চারি করছিলেন সদর নায়েব। লালনকে দেখেই কাছে ডাকেন, এই যে—এদিকে এসো সাঁইজী।

লালন এগিয়ে যায়।

সদর নায়েব বলেন, আছো কেমন?

লালন বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলে, আর থাকা না থাকা। দেহটায় ঘুন ধরেছে। ঘুন ধরা দেহটা আর কদিন। এখন ঘুমিয়ে পড়লেই ব্যস্। সব জ্বালা জুড়োয়।

—বোসো। সদর নায়েব বলেন, তারপর আজকাল তো আর এদিকে বড় একটা আসো না।

—আসতে পারিনে। আসবো কখন? আখড়ায় যে মৌচাক হয়েছে।

বলে লালন বারান্দার কোণে বসে পড়ে।

—আহা ওখানে বসছো কেন? সদর নায়েব বলেন, বেঞ্চি রয়েছে তো।

—মাটির আসনই ভালো। লালন বলে, আরাম বলুন, বিরাম বলুন, মাটির ওপরেই সব। মাটি হলো মা। মায়ের কোলের চেয়ে আর কি আছে। যাক গে ওসব কথা, এখন কিছু ফলারের ব্যবস্থা করুন, বেজায় ক্ষিধে পেয়েছে।

শুধু খাওয়া নয়, কাছারি বাড়ি থেকে কিছু পাওনাও হলো লালনের। চাল, ডাল, কাঁচা আনাজ—সিধে সাজিয়ে দিলে দরোয়ান। তারপরেও নগদ একটি টাকা।

অপরাহ্ণের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

আর নয়, এবারে ফিরে যেতে হবে লালনকে।

এবারে আর পায়ে হেঁটে নয়, নদী পথেই যাওয়া ঠিক করলো লালন।

পথ তো কম নয়। দূরের পথ। শেষ বিকেলে নৌকোয় চেপে সেউড়িয়ার ঘাটে এসে পৌঁছলো যখন, তখন রাতের প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হয়েছে।

ডিঙি থেকে নামবার মুখে লালনের খেয়াল হলো, তার হাতের লাঠি গাছটা নেই। বলে, হ্যাঁরে ভোলাই, লাঠি গাছটা কোথায় রে? ছাখতো ডিঙির খোলে পড়ে আছে কি না।

ডিঙির ভিতর বার খুঁজে দেখলো ভোলাই। লাঠি নেই।

—কি রে ভোলাই, পেলি না?

—না সাঁইজী।

—যাগ গে, তুই আয়। লালন বলে, অনেককালের লাঠি এতদিনে হাত-ছাড়া হলো। যাবে রে—এমনি করে সব কিছু হাত ছাড়া হয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না। নে, আমার হাতটা ধর ভোলাই।

অন্ধকার রাত।

ভোলাই-এর হাত ধরে পথ চলছে লালন। চলতে চলতে এক সময় বলে, পা দুটোয় আর তেমন বল পাইনে। ভাবছি, এবারে ঘোড়া কিনবো। কি বলিস?

ভোলাই বলে, শেষটা আবার বিপদ ঘটুক।

লালন বলে, বিপদ ঘটবে কেন? আমি তো আর ঘোড়া ছোটাবো না। চুপ করে বসে থাকবো ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া তার খুশি মতো চলবে।

কথায় কথায় বাকি পথটুকু শেষ হয়ে যায়।

আখড়ার চৌহদ্দির ভিতরে এসেই লালন চিৎকার করে ডাকে সাকিনাকে, কই গো, আলোটা ধরো।

সাকিনা প্রদীপ হাতে দাওয়ার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে, এত রাত হলো?

—এমন কি আর রাত হয়েছে। লালন হাতের একতারা, কাঁধের ঝোলাঝুলি সাকিনার হাতে তুলে দেয়। আজ আর কেউ আসেনি বুঝি?

—এই তো সব গেল। শুধু শীতল রয়েছে।

—কোথায় সে ছোঁড়া ?

—এই তো ছিল এখানে।

—যাক গে। লালন দাওয়ার ওপর জলচৌকিতে বসে বলে, একটু তামাক সাজো তো।

আরাম করে বসে তামাক টানতে আরম্ভ করে লালন। তারপর একসময় কি মনে হয় তার, সাকিনাকে ডেকে বলে, এবারে যখন কোথাও যাবো, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

সাকিনা একথা শুনে যেন কিছুটা অবাক হয়।

লালন একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলে, এক খুঁটিতে তো অনেককাল বাঁধা রইলে, এবারে বাইরের দুনিয়াটা একবার ঘুরিয়ে আনবো।

—আমি এই খুঁটিতেই বেশ আছি।

—ওটা মুখের কথা। লালন হেসে বলে, তোমার মন কিন্তু অন্য কথা বলতে চাইছে। সত্যি বলো তো—ঠিক বলেছি কি না ?

সাকিনা কিছু বলতে যায়, কিন্তু বলতে পারে না। শীতলকে দেখে চুপ করে যায়।

উঠোন পেরিয়ে শীতল এদিকেই আসছে।

—কি রে শীতল, লালন বলে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

—একটু বাইরে গিয়েছিলাম।

—বাইরের টানটা তোর বড্ড বেশী। বাইরে যাবি তো অনেক দূরে চলে যা। আনাচে-কানাচে ঘুরে কি বাইরের নেশা মেটে ? শোন—কাছে আয়।

শীতল একটু ভয়ে-ভয়েই এগিয়ে আসে। কি জানি, কি বলবে লালন সাঁই।

—শোন, এবারে বে-থা কর। আমরা তো বুড়িয়ে গেলাম—এবার তোরা সব আর দুটো করে হাত যোগাড় কর, চার হাতে সেবা কর আখড়ার।

শীতল চুপ করে থাকে।

লালন এবারে শীতলের পিঠে মৃদু করাঘাত করে বলে, কি রে ছোঁড়া, চুপ করে রইলি কেন ? বে করবি তো।

সাকিনা এবারে বলে ওঠে, আঃ, ওকি মুখ ফুটে সে কথা বলবে ?

—কেন বলবে না ? ব্যাটা কি হাবাগোবা।

শীতল আর দাঁড়াতে চায় না। সরে যেতে চায়। কিন্তু লালন তার হাত টেনে ধরে। বলে, পালাচ্ছিস কোথায় ? এবারে তোর আর ভোলাই ছোঁড়ার একটা ব্যবস্থা করছি।

শিলাইদহে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ।

সেদিন অপরাহ্ণে কাছারি বাড়ির বারান্দায় বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ কথা বলছেন স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে। এরই মধ্যে এক সময় তাঁর চোখ পড়লো আঁকাবাঁকা একটি বিচিত্র লাঠির ওপর। জানতে চাইলেন, অমন লাঠি কোত্থেকে এলো।

সদর নায়েব দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, সেদিন লালন সাঁই এসেছিল, ভুল করে ফেলে গেছে।

—লালন ! সে তো অনেককালের মানুষ। শুনেছি বাবা যখনই এখানে আসতেন, সে-ও আসতো গান শোনাতে। আমিও একবার তাকে দেখেছি। খুব ছোট ছিলাম তখন, বাবার সঙ্গে এসেছিলাম এখানে। মনে আছে আলখাল্লা পরা সেই বাউল কাছারি বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে একতারা বাজিয়ে গান গেয়েছিল। গানের কথাটা মনে নেই, তবে সুরটা আমার মনের মধ্যে জড়িয়ে আছে। এখনো কি সে তেমনি গায়।

—হ্যাঁ, এত বয়েস হয়েছে কিন্তু এখনো তার গানের সুরে ভাঁটা পড়েনি

—একবার খবর দিয়ো তাকে। বোলো, তার লাঠিটা এখানেই পড়ে আছে। আর বোলো আমি তার গান শুনতে চেয়েছি। বাউলের কণ্ঠে বাংলা দেশের মাটির গান—ইট কাঠের শহরে শুনতে পাই না।

পরদিনই লালনের কাছে লোক গেল।

ছোট বাবুমশায় অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তার গান শুনতে চেয়েছেন—লালন কি না এসে পারে !

সেদিন দুপুরের পর লালনের ছোট্ট ডিঙি এসে পৌঁছলো শিলাইদহে।

নদীবক্ষে বোটের ওপর রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে আরো কয়েকজন।

লালনের ডিঙি এসে লাগলো বোটের গায়ে। রবীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। দৃষ্টি তাঁর বৃদ্ধ লালনের দিকে।

লালনও দূর থেকে এক নজরে দেখলো রবীন্দ্রনাথকে। দেখেই স্বগতোক্তির স্বরে বলে, আহা কাকে দেখলাম!

—এসো বাউল।

বোটের ওপর উঠে এলো লালন। দাঁড়ালো রবীন্দ্রনাথের মুখোমুখি। কি দেখলো রবীন্দ্রনাথের মুখের রেখায় সেই জানে। মুখে ফুটলো বিচিত্র হাসি। বললে, মনের মধ্যে ঠিক এমনি ছবি এঁকেছিলাম। এতটুকু অমিল নেই।

—বোসো বাউল।

—বসবো বৈকি। বসবো না! লালনের মনে এক বিচিত্র ভাবের উদয় হয়েছে। বলে, এখানে তো আমার আসন পাতা।

—গান শোনাবে তো? রবীন্দ্রনাথ মৃদু হাসি মিশিয়ে বলেন, তোমাকে আমি চিনি বাউল। বাবার কাছে তোমার কথা শুনেছি।

—তাঁর অনুগ্রহ। লালন বলে, আমরা তো তাঁরই সন্তান। মহর্ষি ছিলেন আমাদের মনের মানুষ।

রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। লালনের শেষ কথা তাঁর কানে যায়নি।

—তোমার মধ্যে আমি সেই মানুষটার ছায়া দেখেছি ছোট বাবুমশায়।

—কোন্ মানুষ?

—সেই মানুষ, বাউল যাকে খুঁজে বেড়ায়।

উঠে দাঁড়ায় লালন। ভোলাইকে ডেকে বলে, ওরে ভোলাই ঘুঙুর জোড়া পায়ে বেঁধে দে তো।

কাছেই ছিল ভোলাই। এগিয়ে এসে ঘুঙুর বেঁধে দিলে লালনের দুটি পায়ে।

পা দুটি নেড়ে ঘুঙুরের আওয়াজ করলো লালন। তারপর হাতে তুলে নিলে একতারা আর খঞ্জনি।

একতারায় সুর জাগলো। সুর জাগলো লালনের কণ্ঠে। লালন ভাবাবেশে বিভোর হয়ে গাইতে আরম্ভ করলো—

'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি।

গান শেষ হলো।

অভিভূত রবীন্দ্রনাথ লালনকে দু'বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। আর লালন তখন ভাবাবেগে বিভোর হয়ে কেবলই বলছে, আহা কি দেখলাম!

—তুমি বাউলের বাউল! রবীন্দ্রনাথ বলেন, তুমি বাউলের রাজা। তোমার কণ্ঠে বাংলা দেশের মাটির গান।

—আর তুমি! লালনের মুখ-চোখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। বলে, ছোট বাবুমশায়, তোমার মধ্যে আমি দেখে গেলাম তামাম দুনিয়ার বাউলকে।

—বাউল?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমার কণ্ঠে তুমি বাংলা দেশের মাটির গান শুনেছো, আর তুমি হবে তামাম দুনিয়ার বাউল কবি।

তরুণ রবীন্দ্রনাথ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন লালনের মুখের দিকে।

লালনের মুখের রেখায়-রেখায় বিচিত্র হাসির ছটা।

সূর্য অস্ত যায়। দিনান্তের রঙ আস্তে আস্তে হারিয়ে যায় আকাশ-পট থেকে।

সন্ধ্যা নামে পদ্মার পরিবেশ জুড়ে। লালনকে এবারে ফিরে যেতে হবে আখড়ায়।

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লালন তার ছোট্ট ডিঙিতে ওঠে।

পদ্মার ঢেউ ভেঙে ডিঙিটা এগিয়ে যায়।

ঢেউ-এর দোলায় দুলছে লালনের ডিঙি। তারই ছন্দে বাজছে লালনের একতারা।

অনেক দিনের পুরোনো সুর নতুন করে বাজছে।

লালনের এক ভক্ত শিষ্য একটি ছোট ঘোড়া এনেছে। ঘোড়া পেয়ে লালন মহা খুশি। বলে, এতদিন দু'পায়ে চলেছি এবারে চার পায়ে চলবো।

সাকিনা বলে, এই বয়সে নাই-বা ঘোড়ায় চাপলে। শেষটা বিপদ-আপদ ঘটবে।

লালন বলে, জানো তো একটা চলতি কথা আছে, বুড়ো বয়েসে ঘোড়া রোগ।

সাকিনা কেমন যেন লজ্জা পায় লালনের কথায়। বলে, তোমার মুখে কি কিছু আটকায় না?

লালন বলে, আমার তো পাস করা মুখ। কিন্তু আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি তোমার মুখেও কিছু আটকায় না, আমি তো টের পাই, তোমার কথায় কাঁকড়া বিছের জ্বালা।

সাকিনা আর দাঁড়ায় না। দরজার আড়ালে সরে যায়। সেখান থেকেও তাকে বলতে শোনা যায়, নয় তো কি তোমাকে ধরে রাখতে পারতাম।

আখড়ায় সেই মুহূর্তে অনেকেই উপস্থিত ছিল। লালন আর সাকিনার কথায় সবাই মুখ টিপে হাসে।

যে লোকটি ঘোড়া এনেছে তার নাম বাহার আলী। সে-ও দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসছিল।

—হ্যাঁ রে বাহার, লালন জিজ্ঞাসা করে, তোর ঘোড়াটার নাম কি রে?

বাহার নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

—একটা কিছু বলে ডাকিস তো?

—না সাঁইজী, ওর কোনো নাম নেই। বাহার বলে, ঘোড়ার আবার নাম রাখবো কি!

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল ঘোড়াটা। লালন এগিয়ে যায় ঘোড়াটার কাছে। প্রথমে দাঁড়িয়ে থেকে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। ঘোড়াটা মাথা উঁচু করে লালনকে লক্ষ্য করে।

এবারে হঠাৎ নিজের খেয়ালে রেকাবে পা দিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘোড়ায় চেপে বসে লালন। বলে, দেখলি তো, এ ব্যাটা আমারে কেমন চিনে নিয়েছে, কেমন পোষ মেনেছে। ওরে মনের মধ্যে প্রেম থাকলে বনের জন্তু-জানোয়ারও পোষ মানে। আর এ-তো পোষা ঘোড়া। বুঝলি, এ আমার মাতব্বর ঘোড়া। একে তোরা সবাই মাতব্বর বলে ডাকবি।

বলে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে মুখটা পথের দিকে ঘোরায়।

ভোলাই বলে, চললে কোথায় সাঁইজী।

—যাই, একটু ঘুরে আসি। অনেকদিন কাঙালকে দেখিনি, ভাবছি মাতব্বরকে নিয়ে কাঙালের কাছে যাই।

—কিন্তু এতো পথ যাবে, অভ্যেস নেই তো ঘোড়ায় চাপা—ভোলাই বলে, আজই না গেলে হয় না সাঁইজী ?

লালন ততোক্ষণে খানিক পথ এগিয়ে গেছে। বলে, তোরা ভাবছিস কেন, ছাখ না সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসবো।

নিভৃত আশ্রম প্রাঙ্গণে কাঙাল বসেছিলেন। একা।

সচকিত হরিনাথ ফিরে তাকালেন পথের দিকে। ঘোড়ায় চেপে লালন আসছে।

আশ্রম প্রাঙ্গণে পৌঁছে লালন ঘোড়া থেকে নামতে যায়। কিন্তু নামতে অসুবিধে। ঘোড়াটা কেমন যেন ছটফট করছে।

কাঙাল ততোক্ষণে কাছে এসেছেন। হেসে বলেন, এ আবার কি খেয়াল তোমার ?

—আরে ছু' পায়ে তো হেঁটেছি এতো কাল—দেখলাম এমনি চলায় কি মজা। লালন হাতটা এগিয়ে দেয়। বলে, হাতটা একবার ধরো কাঙাল।

কাঙালের হাত ধরে লালন নেমে আসে।

কাঙাল বলেন, তোমার যতো সব আজগুবি ব্যাপার। এই বয়েসে এ-সব শখ কেন ?

লালন মৃছু হেসে বলে, কি হবে বয়েসের কথা ভেবে। বয়েসটা তো কমছে।

—কমছে ! তার মানে ?

—মানে সহজ। লালন বলে, জন্মেছিলে তো একশ বছরের পরমায়ু নিয়ে। বাকি আর আছে কতো ? সময়ের পথটা তো হেঁটে পেরিয়ে এলে। বাকি পথটা তুমি যেয়ো পায়ে হেঁটে, আমি যাবো ঘোড়ায় চেপে।—কি হে বুঝলে তো ?

কাঙাল হেসে বলেন, তোমার চেয়ে আমি ছু পায়ে হেঁটে আগে যাবো।

—আচ্ছা দেখবো, কে আগে যায়।

—আমার তো সময় ফুরিয়ে এসেছে। এখন টিকিট কেটে গাড়িতে উঠতে যেটুকু সময়। তারপর আর কি। কোম্পানির গাড়িতে চেপে একেবারে শেষ ইস্টিশানে নামা।

—যা বলেছো। লালন বলে, ইস্টিশান থেকে সিধে পথটা চলে গেছে একেবারে ব্রহ্মার ঘরের দরজায়। সেখানে গিয়ে একেবারে গ্যাঁট হয়ে বসা। হাসি নেই, কান্না নেই, সুখ-দুঃখ নেই—সে এক আজব জায়গা। বলতে পারো কাঙাল, সে ইস্টিশনের টিকিট কোথায় পাওয়া যাবে?

কাঙাল বলেন, এবারে তুমি ভাবিয়ে তুললে লালন।

লালন বলে, এসো—দুজনে বসে বসে সেই ভাবনা ভাবি। ভাবের রাজ্যে বসে থাকলে সব ভাবনা হারিয়ে যায় এক ভাবে।

আশ্রমের একান্তে ইটে বাঁধানো গোলাকার বেদী। ওপরে শিউলি গাছের আচ্ছাদন। বেদীর ওপর বসে দুটি মন সত্যি এক ভাবের রাজ্যে হারিয়ে গেল।

ঘরে ফিরতে অনেক রাত হলো লালনের।

সাকিনা তার অপেক্ষায় বসে ছিল দরজার আড়ালে। সাড়া পেয়েই আলো হাতে বাইরে আসে।

—তুমি এখনো জেগে আছো সাকিনা?

—দেখছোই তো! সাকিনা বলে, ঘরে তো তোমার মন বসে না। কিন্তু আমার কথাটা কি কোনদিন ভেবে দেখেছো? একলা ঘরে কেমন করে সময় কাটে আমার।

লালন মৃদু হাসে। কথা বলে না। ঘরে এসে কাঁধের ঝোলাঝুলি নামিয়ে রাখে।

—হাত-মুখ ধুয়ে নাও। আমি ভাত বাড়ছি।

বলে সাকিনা রান্নাঘরে যায়।

এদিকে লালনও হাতে-মুখে জল দিয়ে সাকিনার সামনে এসে দাঁড়ায়।

খেতে বসলো লালন। পাশে পিলসুজের ওপর জ্বলছে মাটির প্রদীপ। সাকিনা বসে আছে চুপচাপ।

লালন বলে, জানো—সেই প্রথম দেখার দিন থেকে কতোদিন গেল—চোখের সামনে দিয়ে তো কয়েকটা যুগই কেটে গেছে, কিন্তু এখনো তুমি ঠিক আগের মতনই রয়ে গেছো।

সাকিনা বলে, থাক—আমাকে আর কথায় ভোলাতে হবে না। তোমার সঙ্গে তো কথায় পারবো না।

লালন বলে, আহা রাগ করছো কেন ? আমি তোমায় এমন কি বলেছি ?

ঠিক এই মুহূর্তে বাইরে থেকে যেন কার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। লালন, সাকিনা দুজনই সচকিত হয়ে শোনে নারী কণ্ঠের আর্তস্বর। ডাকছে—সাঁই বাবা, সাঁই বাবা।

লালন উঠে আসে মুহূর্তে। প্রদীপ হাতে সাকিনাও এসে দাঁড়ায়। দুজনেই অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে উদ্‌ভ্রান্ত এক রমণীকে।

রমণী লুটিয়ে পড়ে লালনের পায়ের ওপর। ভেঙে পড়ে অশান্ত কান্নার আবেগে।

—তুমি কে মা ?

—আমি ভঙ্গুরী।

—ভঙ্গুরী ! লালন হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায়।

—কথা বলছো না কেন সাঁইবাবা ?

—কি হয়েছে তোমার ?

কাঁদতে কাঁদতে ভঙ্গুরী বলে যায় তার কথা। গ্রামের মানুষ তার ছোট্ট কুঁড়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। শাসিয়েছে মাথা মুড়িয়ে দেবে বলে। কিন্তু তার আগেই সে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসেছে এখানে।

লালন বলে, মা—আমি তো জানি তোমার কথা। এতদিন চোখে দেখিনি, তবে লোকের মুখে শুনেছি, তুমি হাটের কাছে থাকো।

—সাঁইবাবা ?

—এমনি করেই দয়াময় পাপের দুনিয়া থেকে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়। স্বগতোক্তির সুরে লালন বলে, এমনি করে দয়াময় আমাদের পথের খবর বলে দেয়। যে পথ চলে গেছে দয়াময়ের খাশমহলের দরজায়।

—সাঁইবাবা ! ভঙ্গুরী কাতরকণ্ঠে বলে, আমার কি হবে ?

—দয়াময়ের যা ইচ্ছে তাই হবে। গাঁয়ের মানুষ তোমার ঘর পুড়িয়ে দেয়নি মা—দয়াময় ওই সব মানুষের হাত দিয়ে তোমার জীবনের জঞ্জাল, পাপ সব পুড়িয়ে সাফ করে দিয়েছে।

—সাঁইবাবা !

—পিছন দিকে ফিরে তাকিয়ো না মা। এতদিন বাইরের রূপ-চটক নিয়ে নিজে মজেছো, অপরকে মজিয়েছো,—এবারে পানা পুকুরে পাঁক গোলা জলে ডুব দাও—দেখবে, সেখানে মনটা কেমন পদ্ম হয়ে ফুটেছে।

যাও মা স্থির হয়ে বোসো গে। আগে তোমার মনটাকে থিতিয়ে নাও—তারপর বোলো তোমার কথা, শুনবো।

ভঙ্গুরীর মুখের উপর প্রদীপের শিখাটা কাঁপছে।

অবাক চোখে সে তাকিয়ে আছে লালনের মুখের দিকে।

বারবণিতা ভঙ্গুরী আশ্রয় পেলো লালনের আখড়ায়। এই নিয়ে নানা-জনের নানা মন্তব্য শুনতে হলো লালনকে।

কিন্তু নির্বিকার লালন। শুনে হাসে। কখনো বলে, জন্মেছিলাম মায়ের গর্ভে। কোলও পেয়েছিলাম। কপালে সইলো না। নতুন করে আবার মা পেলাম। তাও গেল। ছিলাম লালন কর। নামটা বদলে দিলে সবাই মিলে। লালন ফকিরের থাকার মধ্যে আছে একতারাটা। চরিত্তির তো আগেই গেছে। ভঙ্গুরী আর নতুন করে কি নেবে। এই নড়বড়ে পুরোনো দেহটায় কি ওর মন ভরবে? তা যদি ভরতো, তা নয় দিতাম। আমার দেহটাই তো এখন বোঝা হয়ে গেছে। কে জানে এ বোঝাটা আর কতদিন বইতে হবে।

এমন ধারা আরও কথা বলে যায় লালন। শেষটা লোকের মুখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

এরই মধ্যে একদিন সকালে লালন কাছে ডাকে ভঙ্গুরীকে। জিজ্ঞাসা করে, পায়েস রাঁধতে পারো মা?

আচমকা এ ধরনের জিজ্ঞাসার অর্থ খুঁজে পায় না ভঙ্গুরী।

লালন বলে, পারো তো আজ নারকেল দুধের পায়েস বানাও।

ভোলাই, শীতল তারা কাছেই ছিল। ভাবে, সাঁইজীর আবার এক আজগুবি খেয়াল।

কিন্তু মুখ ফুটে কেউ-ই কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে না। তারা তো জানে সাঁইজীকে। তবে মনে মনে সবাই বোঝে, একটা কিছু কারণ আছে এর পিছনে।

সন্ধ্যায়।

লালনের আখড়ায় ভিড় করেছে ভক্তজনেরা

লালনের মনেও যেন আজ খুশির অন্ত নেই। আজ আর তত্ত্বকথা নয়, নানা রঙ্গের আসর বসেছে আখড়ায়।

সাকিনাও আজ অন্য দিনের চেয়ে ভক্তদের নিয়ে অনেক বেশী ব্যস্ত।

ভোলাই, শীতল, পাঁচু—এরা সাঁইজীর সবচেয়ে কাছের মানুষ। তারা এখনো পর্যন্ত কিছুই জানে না। এক সময় তাদের মধ্যেও আলোচনা আরম্ভ হয়ে যায়।

ভোলাই বলে, কি ব্যাপার রে শীতল ?

শীতল বলে, কি করে জানবো ? বাজারের মেয়েমানুষ দিয়ে পায়েস রাঁধানো, তারপর তাকে আবার আড়াল করে রাখলো—কি জানি, সাঁইজীর লীলে বোঝা ভার।

ভোলাই বলে, দেখবি শেষ পর্যন্ত রঙের টেক্কা তুরূপ মেরে বাজীমাৎ করবে সাঁইজী।

সত্যি ব্যাপারটা যে এমনি ঘটবে, কেউ-ই ভাবেনি। কেবল সাকিনা জানতো, তাকে আগেভাগে বলে রেখেছিল লালন।

সন্ধ্যে উতরে যেতে শীতল আর ভোলাইকে কাছে ডাকে লালন। বলে, দে—পাত পেতে দে গড়-গড়াস্তি। রোজ রোজ 'পুনারা' শুধু জল-বাতাসা খায়, আজ পায়েস খাওয়াবো।

আখড়ার নিকোনো উঠোনে পাতা পেতে দিলে শীতল আর ভোলাই। লালন দাঁড়িয়ে রইলো একান্তে। সাকিনা পরিবেশন করতে আরম্ভ করে।

ভক্তজনেরা আখড়ার পরমান্ন প্রসাদ গ্রহণ করছে।

লালন জিজ্ঞাসা করে, কি গো পুনারা, পায়েস কেমন হয়েছে বলো ?

চমৎকার !

নানা কণ্ঠে একই উত্তর।

লালন বলে, পেট পুরে খাও। মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার শেষ হবে না।

একজন ভক্ত বলে ওঠে, আজ কি ব্যাপার বলো তো সাঁইজী ?

লালন বলে, ব্যাপার আবার কি। এ সব তাঁরই ইচ্ছেয়। আমরা তো নিমিত্ত মাত্র।

হাসতে আরম্ভ করে লালন। তারপর বলে, কি রে, সব হাত গুটিয়ে

নিচ্ছিস কেন? এরই মধ্যে হয়ে গেল সব? না—তোরা সব কোনো কাজের ন'স।

—আর কতো খাবো সাঁইজী। একজন পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, আর খেলে যে দম ফেটে মরে যাবো।

—বালাই ষাট, মরবি কেন? বলে লালন হো হো করে হাসতে আরম্ভ করে দেয়।

কি হলো সাঁইজীর। হঠাৎ এমন হাসি কেন?

— তাহলে ভঙ্গুরীর হাতের রান্নাটা ভালোই হয়েছে বল?

হঠাৎ ভঙ্গুরীর কথায় যেন মৌচাকে ঢিল পড়ে। ভঙ্গুরীকে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে লালনকে কম কথা শোনায়নি এরা।

—ওরে, জাত যখন গেছে আর উগরে ফেলে কি করবি। লালনকে এবারে কিছুটা গম্ভীর মনে হয়। বলে, ওরে যে জলে জীবন ধরি, আবার সেই জলেই শৌচ কাজ করি। তাতে জলের নাম বদলায়, না ধর্ম বদলায়? তেমনি হলো মানুষ। মানুষের আবার তুটো ভাগ। নর আর নারী।

একবার ভক্তজনের মুখের দিকে ফিরে চায় লালন। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করে, জানিস তো- রত্নাকর ডাকাত ছিল, হলো বাল্মিকী মুনি। জগাই মাধাই তুশমন ছিল, হলো মহাভক্ত। ভঙ্গুরী এতদিন বাজারে দেহ বিকিয়েছে, বলতে পারিস তার খরিদ্দার ছিল কারা? সে-ও তো এই আমরাই ছিলাম রে! যাক্‌গে ও কথা। এবারে শোন, এবারে ভঙ্গুরী দেহটাকে সরিয়ে রেখে মন নিয়ে কারবার করবে। ওরে, তোরা সব বাইরের পাপটাকেই দেখিস। কিন্তু পাপ আবার কিরে। অকাজটাই পাপ। এতদিন অকাজ করেছে, এবারে কাজ করবে। দেখলি তো পরখ করে, কেমন পায়েস বানিয়েছে। ওরে— মানুষকে তোরা অমন করে হেনস্তা করিস নে। মানুষের মধ্যেই তো সেই মানুষের বাস। আর নারী, সে তো হলো মা। মায়ের নামে কলঙ্ক দিতে নেই রে। তাতে নিজের গায়েই কলঙ্ক লাগে। নিজের ভিতরের মানুষটা তাতে তুঃখ পায়। সে মানুষ যে সব কিছুর ওপরে।

—সাঁইজী। একজন এগিয়ে এসে লালনের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করে, সাঁইজী, আমিই যে ভঙ্গুরীর ঘরে আগুন দিয়েছি। আমার কি গতি হবে?

—ওরে তুই তো উপলক্ষ্য। তোকে দিয়েই তো তিনি একাজ

করিয়েছেন। তার ঘর পুড়লো বলেই তো সে নতুন ঘরের খবর করলে। ওরে আমরা 'আমি আমি' করে মরি—কিন্তু আসলে আমরা কেউ-ই সেই আসল 'আমি'র খবর করি নে। এই বাইরের 'আমি'—এ হলো কলের পুতুল।

বলতে বলতে লালনের কণ্ঠস্বর অব্যক্ত আবেগে আর গভীর বেদনায় সিক্ত হয়ে ওঠে। ভক্তজনেরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে লালনের মুখের দিকে।

লালনের কথা তখনো শেষ হয়নি। বলে, ওরে মনের আধার হলো এই দেহটা। মনের সেই সুন্দর আমিটা যখন জাগে, তখন বাইরের চেহারাও বদলে যায়। কদিন আগে তো ভঙ্গুরীকে তোরা দেখেছিস, আর আজ একবার চোখ মেলে চেয়ে ছাখ—দেখবি কতো বদলে গেছে সে। চিনতে পারবি না।

বলে ভঙ্গুরীকে ডাক দেয় লালন।

সলজ্জ পদক্ষেপে সাকিনার পিছু পিছু ছায়ামূর্তির মতো আখড়ার সামনে এসে দাঁড়ায় ভঙ্গুরী।

সকলেরই দৃষ্টি ভঙ্গুরীর দিকে। সত্যি যেন চেনাই যায় না তাকে।

ভঙ্গুরীর পরনে গেরুয়া রঙের শাড়ি, নিরাভরণ দেহ, আয়ত দৃষ্টিতে তার অপূর্ব স্বচ্ছতা—যেন এক পবিত্র নারীমূর্তি।

লালন বলে, ওরে ভগবানের কৃপা হলে এমনি হয়। আর ভগবান খুঁজতে মন্দিরেও যেতে হয় না, মসজিদ গির্জাতেও না। এই দেহ-কুঠরীর মধ্যেই তিনি স্ব-রূপে বসে আছেন। তাই বলি, বাইরে থেকে মানুষের বিচার করিস নে। তা ছাড়া কার বিচার কে করে! বিচার না করে নির্বিচারে ভালোবাসবি। জীবনের সব কিছু হারিয়ে যায়, শুধু হারায় না ভালোবাসার ধন। ভালোবাসার চেয়ে বড়ো কিছু নেই রে, ওরে তোরা সব ভালোবাসতে শেখ—দেখবি কতো আনন্দ পাবি।

বলতে বলতে লালন চলে যায় আখড়ার একান্তে ফুলবাগানের দিকে। যেখানে রয়েছে লালনের ছোট্ট একটা চালা। যেখানে বসে সাধন-সংগীত রচনা করে সে।

আখড়ায় সমবেত ভক্তজনেরা এক-এক করে নীরবে চলে যায়। তবু সাকিনার পাশে ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে ভঙ্গুরী। যার দু'চোখে তখন জল টলমল করছে।

কাঙাল হরিনাথের কুটির অঙ্গনে সেদিন অজস্র মানুষের ভিড়!

কাঙালের কণ্ঠেও প্রেমের অমৃতবাণী। গুণমুগ্ধদের উদ্দেশ্য করে কাঙাল বলছেন, ওরে ভালোবেসে ফকির হবি। নিজের বলতে কিছু রাখবি নে। তোরা তো জানিস, প্রেম বিলিয়ে ফকির হয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। ঈশা, মুসাও তো ফকির। কিন্তু এরা সবাই রাজার রাজা। সেই রাজার গুপ্তধনের খোঁজ যে পেয়েছে, তার কি হীরে মুক্তো জহরতে মন ভরে? তাই বলি— মানুষের জীবন যখন পেয়েছি, তখন সেই জীবনটাকে নষ্ট করে কি লাভ? ঈশ্বর দিয়েছেন প্রেম, সেটাকে উজাড় করে দাও— নিজের জন্যে থাক শুধু ভক্তি। যা ঈশ্বরের পাদপদ্মে অর্পণ করে স্বর্গে যাওয়ার কড়ি চেয়ে নেবো। চাইতে জানলে ভক্তির বিনিময়ে ঈশ্বরের কাছ থেকেও কিছু না কিছু পাওয়া যায়।

রোগশয্যায় শায়িত কাঙাল হরিনাথ। ভক্তজনেরা তাঁকে দর্শন করতে এসেছে।

অসুস্থতার মধ্যেও কাঙাল তাঁর ভক্তজনদের উদ্দেশ্যে বলে যান জীবনের অমৃত কথা।

কথা বলতে কষ্ট হয়, তবু মুখের কথা শেষ হয় না। বলেন, সারাজীবন ধরে প্রেম বিলিয়েছি। কিন্তু কৃপণের মতো আঁকড়ে রেখেছি ভক্তি ধন। সে ধন ঈশ্বর ছাড়া কাউকে দেবো না।

কাঙাল হরিনাথ হঠাৎ কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠেন। কথার মধ্যে বলে ওঠেন. ওরে—তোরা আমাকে একবার বসিয়ে দে তো।

ভক্তজনরা এগিয়ে আসে কাঙালের শয্যাপ্রান্তে।

—দেখছিস কি? আমাকে একবার বসিয়ে দে তোরা। বলে হাত দুটো সামনে প্রসারিত করেন।

কাঙালকে ধরে বসিয়ে দিলে ভক্তজনেরা।

প্রথমেই চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন কাঙাল। তারপর দু চোখ বন্ধ করে হাত দুটি বুকের কাছে রাখলেন।

কাঙালের দেহটা বারবার রোমাঞ্চিত হতে লাগলো। কি জানি মনের মধ্যে কি ভাবের উদয় হয়েছে।

এই মুহূর্তে ভেসে এলো দূরাগত কণ্ঠের সুমধুর সংগীত।

কাঙাল চোখ মেলে তাকালেন।

এ কণ্ঠস্বর লালনের।

লালনের কণ্ঠে কাঙালের গানের ভাষা।

'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যে হলো
পার করো আমারে।'

গান গেয়ে এগিয়ে আসছে লালন।

কাঙালের মুখের রেখা বদলে যায়। হাসি ফুটে ওঠে মুখে। পরিপূর্ণ জীবনের হাসি।

কাছে এলো লালন। গানের একই কলি বারবার গাইতে লাগলো। তারপর কাঙালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, কি গো—কেমন আছো? এরই মধ্যে আবার যাবার তাড়া কেন?

কাঙাল কথা বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। কে যেন তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

ইঙ্গিতে লালনকে কি যেন বোঝাতে চাইলেন কাঙাল। কি বুঝলো লালনই জানে, তার মুখে ফুটে উঠলো বিচিত্র হাসি। বললে, বুঝতে পেরেছি—কিন্তু আমাকে ফেলে যেতে পারবে তুমি?

কাঙাল অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন লালনের মুখের দিকে।

লালনের দৃষ্টিও কাঙালের দৃষ্টিতে এসে স্থির হয়েছে।

দু'জনের চোখেই তখন জলের ধারা।

এরই মধ্যে লালনের অনুচ্চ কণ্ঠ শোনা যায়, যাবে যাও, কিন্তু কাজটা তুমি ভালো করলে না কাঙাল।

কাঙালের দু'চোখের জল তখন বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে মাটিতে।

—ঠিক আছে। যাবে যাও, লালন ভাঙা ভাঙা সুরে বলে, যাবার সময় আমার আরজিটা শুনে নাও—পারো তো তোমার কাছে আমার জন্যে একটু জায়গা রেখো।

বসে থাকতে থাকতে কাঙালের দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসে। নিঃশ্বাসের গতি দ্রুত হয়। ভক্তজনের চোখও ততক্ষণে সজল হয়ে উঠছে। সকলেরই দৃষ্টি কাঙাল হরিনাথের দিকে।

আর লালন!

তার দু'চোখেও জল। সে জল ঝরে পড়ছে গণ্ড বেয়ে। চোখে জল—অথচ মুখের রেখায় কোথাও এতটুকু কান্নার রঙ মেশানো নেই!

—ওরে তোরা সব নাম শোনাবি না! লালন বলে ওঠে, কাঙাল চলে যাবে, যাবার সময় ওকে তোরা হরিনাম শোনাবি না?

এই ক'টি কথা বলেই লালন তার হাতের একতারাটা শূন্যে তুলে বাজাতে আরম্ভ করে।

একতারার তারে করুণ ঝংকার তুলে গাইতে আরম্ভ করে, সেই একই গানের কলি।

'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যে হলো,
পার করো আমারে।'

লালনের সুরে সুর মেশালো সমবেত নর-নারী।

কাঙালের দেহ-টা বারবার শিউরে উঠলো। কিন্তু আশ্চর্য—তখনো বসে আছেন কাঙাল। দু'জন তাঁকে দু'হাতে ধরে রেখেছে।

এই গানের মধ্যেই কাঙাল হরিনাথের ভিতরের 'আমি' দেহ পিঞ্জর ছেড়ে অসীম অনন্তে মিশে গেল।

মৃত্যুর পরেও কাঙালের মুখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে রইলো গভীর প্রশান্তির চিহ্ন।

নদী তীরে শ্মশান।

কাঙালের শেষ শয্যা রচিত হলো মহাশ্মশানে।

অগণিত নর-নারী এসেছে শেষবারের মতো কাঙাল হরিনাথকে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে।

চিতা জ্বললো। ভক্ত নর-নারীরা ভিড় করে আছে চিতাশয্যার চারিদিকে।

একান্তে মাটির ঢিবির ওপর বসে লালন। দৃষ্টি তার দূরের দিগন্তে।

যেখানে আকাশের বুকে রাতের নক্ষত্রগুলো জ্বলছে।

একটা করুণ সুর যেন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে চারিদিকের পরিবেশ জুড়ে।

লালনের দৃষ্টি উদাস। ভারশূন্য বসে আছে ছায়ামূর্তির মতো। শুধু মাঝে মাঝে জ্বলন্ত চিতার আলোয় তার ছায়ামূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

চিতা নিবলো।

শ্মশানযাত্রী যারা ফিরে চললো হরিধ্বনি দিয়ে।

কিন্তু লালন তখনো বসে আছে সেই মাটির ঢিবির ওপর।

দেখতে দেখতে রাতের বাকি সময়টুকু ফুরিয়ে গেল। পূব-আকাশে স্পষ্ট হয়ে ফুটেলো আলোর আভাস।

এতোক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পায় লালন। উঠে দাঁড়ায়। ফিরে তাকায় চারদিকে। তারপর গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে কাঙালের চিতাশয্যার কাছে।

কিছু নেই। শুধু পড়ে আছে ভস্মশেষ।

লালন দু'হাতে তুলে নেয় কাঙালের চিতাভস্ম। অঞ্জলি দেয় নদীর জলে। আপন মনে বলে, তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে তাই তুমি চলে যেতে পারলে কাঙাল। কিন্তু আমি আর তোমার সঙ্গে যেতে পারলাম কই। দুনিয়ার কাছে অনেক দেনা করেছি, শোধ না করে যে যেতে পারছি না।

উদ্দাম জোয়ারে ভেসে গেল কাঙালের চিতাভস্ম। লালন খানিক সময় স্থির দাঁড়িয়ে রইলো।

তারপর আপন মনে একতারায় ঝংকার তুলে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো।

নদী চলে গেছে এক ঠিকানায়, নদীকে পিছনে রেখে পথ চলে গেছে আর এক ঠিকানায়।

পথিক বাউল লালন পথ চলে, যে আঁকাবাঁকা মাটির পথ, সবুজ প্রান্তর আর ফসলের ক্ষেত পেরিয়ে চলে গেছে দূরের সেই নিবিড় ছায়া জড়ানো গ্রামের দিকে।

যেখানে আখড়ার অঙ্গনে সাকিনা অপেক্ষা করে আছে।